
শৈলেন
ঘোষ
পিরামিডের
দেশে

পিরামিডের দেশে

শৈলেন ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৯৫
এপ্রিল, ১৯৮৮

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
কমল মিত্র
নব মুদ্রণ
১বি রাজা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

দাম : ১০ টাকা

আমার ছোট্ট বন্ধুদের

যারা

পিরামিডের দেশে

অভিনয় করে অবাক করে দিয়েছিল আমাকে

আমাদের প্রকাশিত লেখকের
অপর একটি ছোটদের বই ঃ

হো-বুড়োর খুদে বন্ধু



আমার কেমন যেন অজানা ভয়ে বুকটা ভার হয়ে আসছে। আমার মনে হচ্ছে, ক'দিন পরে আমি বোধ হয় কথাই বলতে পারব না। ধীরে-ধীরে ভারী ক্ষীণ হয়ে আসছে আমার গলার স্বর। হয়তো আর ক'দিন পরেই তোমরা কেউ শুনতেও পাবে না আমার কথা।

হবেই তো। কেননা, ছ-হাজার বছর ধরে ছোট্ট সেই মেয়েটির গল্প বলার জন্য আমি আকুল হয়ে এই পৃথিবীর কোণায়-কোণায় ঘুরে বেড়িয়েছি। আজ আমি বড় ক্লান্ত। ছ-হাজার বছর ধরে আমার চোখের দৃষ্টি-দুটি আঁতিপাতি শূন্য আকাশে ঘুরছে, ফিরছে। এখন আর দেখতে পাই না তেমন করে। দেখতে পাই না আমার পৃথিবীকে। আমার সুন্দর পৃথিবীর সুন্দর মুখখানি।

একদিন যদি সত্যি সব অন্ধকার হয়ে যায়! অন্ধকার হয়ে যায় আমার মনের ভেতরটা! তাহলে মনে-মনেও যে তাকে দেখতে পাব না আমি! দেখতে পাব না সেই ছোট্ট মেয়েটির নিটোল গোলাপ-রাঙা মুখখানি। পাখির পাখার মতো দুরন্ত চোখের পাতা দুটি। কিংবা একঝাঁক কালো মেঘের মতো মাথার রেশম-নরম চুলগুলি। একদিন দেখেছি উড়তে-উড়তে রাশি-রাশি চুল যখন তার কপাল ছুঁয়ে ছড়িয়ে যেত, মনে হত, রাঙা গোলাপের পাপড়িতে ভ্রমর যেন চুমু খাচ্ছে!

হ্যাঁ, আমার কথা বোবা হয়ে আসছে। আমার চোখের দৃষ্টি

অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জানো, সেই ছোট্ট মেয়েটির গানের সুরগুলি আমার কানে-কানে গুনগুন করে এখনও বেজে যায়। আমি শুনতে পাচ্ছি, এখনও। সে বোধ হয় গান গাইছে। এখনও গাইছে। কিন্তু কোথায় ?

সেই ছোট্ট মেয়েটির নাম ছিল জুয়াম। আর আমি! ভাবছ নিশ্চয়ই আমি কে? আমি এক মৃত-সম্রাটের আত্মা। যে-সম্রাট আজ থেকে ছ-হাজার বছর আগে জীবন্ত ছিল সুখে আর স্বাচ্ছন্দ্যে। আনন্দ আর খুশিতে। তার নামটা না-ই বা জানলে। শুধু জেনে রাখো, ছ-হাজার বছর আগে আমি যখন পৃথিবীর আলোয় আমার চোখ দুটি মেলে ধরে আকাশের ওই সূর্যকে প্রণাম করতুম, তখন আমার দেশের মানুষ আমাকে বলত, সূর্যের সন্তান।

হ্যাঁ, সূর্যের সন্তান আমি। আমি এক ফ্যারাও। হয়তো কেউ-কেউ শুনেছে কথাটা, হয়তো শোনেনি অনেকে। কিন্তু এই যে আমার দেশ, এই যে জল-ছুঁই-ছুঁই নীলনদের তীরে-তীরে অসংখ্য মানুষের বাস, তারা জানে আমি তাদের ফ্যারাও। তাদের সম্রাট। দেশের মানুষ কোনদিন আমার নাম ধরে ডাকেনি। তাই তোমাদের কাছে আমিও আমার নাম গোপন করে রাখছি। তোমরা শুধু জেনো, আমি এক ফ্যারাও। দূর সেই দেশ, যেখানে আছে হাজার রহস্যের হাতছানি, অবাক-জগতের পিরামিড অথবা নীলনদের ঢেউ-জাগানো সভ্যতা, সেইখানে আমার রাজত্ব। সে-দেশের নাম মিশর। আমার গল্পের মিশর। স্বপ্নের মিশর।

আমরা বিশ্বাস করতুম আকাশ-সম্রাট সূর্যের চোখের জল অথবা ক্লান্তি-ঝরা ঘাম থেকে এই পৃথিবীতে প্রাণের জন্ম হয়েছে। তাই আমরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ দেবতার আসনে বসিয়েছি। আমাদের এই সূর্য-দেবতাকে আমরা বলি 'রে'। আমার জন্মও হয়েছিল এই 'রে'-র ইচ্ছায়। আমার মার কোনো সন্তান ছিল না। মার প্রার্থনায় 'রে' খুশি হয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ

হবে। তুমি হবে এক দয়াবান আর বীর সন্তানের জননী। সে হবে সম্রাট। আমার শক্তিতে সে হবে বলীয়ান।

হ্যাঁ, আমি সম্রাট। কত যে ঐশ্বর্য আমার, সে আমি বলে শেষ করতে পারব না। তুমি দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো আমার প্রাসাদের দিকে, শুধু সোনা, চারিদিকে সোনা। আমি যে সিংহাসনে বসে আছি, সে-সিংহাসন সোনার। সিংহাসনের মাথায় সূর্যের গোল চক্র সোনার ছটায় জ্বলজ্বল করছে। দ্যাখো তুমি, প্রাসাদের স্তম্ভে-স্তম্ভে ঝাঁক-ঝাঁক উজ্জ্বল সোনার টোপর সাজানো। রুপোর নকশা। অসংখ্য, অগুনতি। বড়-বড় সিংদরজার গায়ে-গায়ে কত-না ঝকমকে রঙিন পাথর।

আমার অভিষেকের দিনে কত মানুষ এসেছে আমার রাজধানীতে উৎসব করতে। দিনটি ছিল হাসি আর খুশিতে উচ্ছল। রঙিন পোশাক পরে মেয়েরা এসেছে নাচ দেখাতে। দূর-দেশের মানুষ এসেছে হাতির পিঠে ঘোড়া ছুটিয়ে। রাতে আলো আর আলো। যেদিকে চাও, দেখবে, আলোর শিখাগুলি কেঁপে-কেঁপে ঝলমল করছে। যেন রূপকথার দেশ আমার আজকের এই রাজধানী। যেন স্বপ্নের গল্প দিয়ে গড়া আমার অভিষেকের এই দিনটি। তারপর আমি যখন আমার মায়ের হাত ধরে সিংহাসনে গিয়ে বসলুম, পুরোহিতরা একস্বরে গেয়ে উঠলেন আমার সিংহাসন-আরোহণের গান। দেশের কত গুণিজন এসেছেন, কত ধনী আর সাধারণ মানুষ। তারা চিৎকার করে আমার জয়ধ্বনি দিল। তারপর আমার হাতে এক-এক করে চারটি রঙিন পাখি তুলে দিলেন পুরোহিতরা। তাদের গলায় সোনার চেনে বেঁধে দেওয়া হল আমার নিশান। আমি একটি-একটি করে ওই শূন্য আকাশে উড়িয়ে দিলুম সেই পাখিদের। তাদের রঙিন ডানাগুলি নীল আকাশে ঢেউ তুলে দূর-আকাশের চার কোণে উড়ে গেল। উড়তে-উড়তে মিলিয়ে গেল।

হ্যাঁ, এই পাখিরা উড়ে যাবে পৃথিবীর চার দিকের চার দেশে। সে-দেশের মানুষরা এই পাখি দেখে বুঝবে, নতুন সম্রাটের অভিষেকের খবর বয়ে এনেছে ওই আকাশের পাখি। তারপর সেই খবর যখন ছড়িয়ে

পড়বে ঘরে-ঘরে, সেই পাখির দল ফিরে আসবে। কিন্তু কোনো পাখি যদি ফিরে না আসে ? তবে বুঝতে হবে, সে বন্দী হয়েছে। যে-দেশে সে বন্দী হয়েছে সে-দেশের মানুষ সম্রাটকে সম্রাট বলে স্বীকার করল না।

দুঃখের কথা, আমার বেলায়ও ঠিক তাই হল। যথাসময়ে ঠিক দিনে তিনটি পাখি ফিরে এল, ফিরল না পশ্চিমদেশের আকাশ থেকে। সুতরাং বুঝতে বাকি রইল না, সে-দেশ মানল না আমায় সম্রাট বলে। আমার বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি নয় সে-দেশ।

এ যে কী অপমানের ব্যাপার সে তো তুমি বুঝতেই পারছ। এ-অপমান আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিল। মনের শান্তি ঘুচিয়ে দিল। নির্জনে একা-একা রাগে ফুঁসতে লাগলুম, "কে সেই বেয়াদপ! কার এত বড় স্পর্ধা আমায় সম্রাট বলে মানে না!"

সুতরাং যুদ্ধ।

সেনাদলের ঘোড়া ছুটল। আমার রথের চাকা ঘড়ঘড়িয়ে কেঁপে উঠল। আকাশ-ঢাকা ধুলো উড়িয়ে আমি পশ্চিমদেশ জয় করতে ছুটলুম। আমার রথের পিছনে সূর্যের জ্বলন্ত ছটার একটি ছবি সাজানো। আমি যেন সেই সূর্যের আগুনে ঝলসে এক ভয়ংকর হিংস্র মানুষ হয়ে গেছি এখন। আমি আমার সেনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লুম পশ্চিমদেশের ওপর। হুকুম দিলুম, "আগুন লাগাও।"

আগুন লাগল পশ্চিমদেশের আনাচে-কানাচে। ঘর-বাড়িতে। যেখানে যা দেখি, সেখানেই আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে।

কিন্তু আশ্চর্য, কেউ তো এল না আমার সামনে, আমায় বাধা দিতে। এল না কোনো সৈনিক। ছুটল না ঘোড়া। বাজল না যুদ্ধের দামামা! কিন্তু আগুন তো জ্বলছে। গিলে খাচ্ছে পশ্চিমের এই দেশটাকে। আমার সেনারা যুদ্ধজয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ছে। অথচ—

এল। পশ্চিমদেশের অসংখ্য মানুষ। তারা কেঁদে উঠল। তারা পাগলের মতো ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল। ছুটতে-ছুটতে তারা আমার কাছেই এগিয়ে আসছে। তাদের হাতে অস্ত্র নেই। তাদের চোখে



কান্না। তাদের দেখে আমি থমকে গেলুম। আমার সেনাদের হুকুম করলুম, "থামো, থামো।"

সেই অসংখ্য মানুষ, আগুনের ভেতর থেকে ছুটতে-ছুটতে আমার সামনে এসে হাত জোড় করে চিৎকার করে উঠল, "হে সম্রাট, আমাদের মেরো না। সম্রাট, আমরা কোনো অন্যায় করিনি। সম্রাট, আমাদের বাঁচাও।" চিৎকার করতে-করতে তারা মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল। সেই আগুনে-পোড়া জীবন্ত মানুষগুলির কী করুণ সেই মিনতি!

আমার রথের চাকা নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবলুম, তবে কি আমি ভুল করলুম! না, ওই মানুষগুলির এটা মিথ্যা অভিনয়! আমি তাই হুংকার দিয়ে বললুম, "কই তোমাদের রাজা?"

পশ্চিমদেশের মানুষেরা একই সঙ্গে তারস্বরে বলে উঠল, "আমাদের রাজা নেই, রাজা নেই। আপনি আমাদের সম্রাট।"

আমি থতমত খেয়ে গেলুম। ভাবলুম, আমি এ কি করেছি! আমার নিজেরই রাজ্যে আমি নিজেই আগুন দিয়েছি!

এদিকে ততক্ষণে সেই বিধ্বংসী আগুন পশ্চিমের পুরোটাই গ্রাস করে ফেলেছে। কত লোক মরেছে, কত ঘর পুড়েছে, কত ছাই উড়েছে, আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমি শুধু মনে-মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠলুম, ছিঃ! ছিঃ! এ আমার কী ভুল! কী ভুল! আর এই ভুলটা ঢাকবার জন্যেই হয়তো আমি তখনই আবার চিৎকার করে উঠলুম, "আমি যদি তোমাদেরই সম্রাট হই, তবে তোমরা কেন আমার পাখিকে বন্দী করেছ?"

তারা আমার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল। তারা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তারপর অবাক চোখে আমার দিকে চোখ চেয়ে কেমন হতভম্বের মতো বলে উঠল, "কোনো পাখি তো আমরা দেখিনি?"

আমি সারথিকে বললুম, "রথের চাকা পিছনে ফেরাও।" আমার সেনাদের হুকুম করলুম, "আগুন নিবিয়ে ফেলো।"

সেনারা আগুন নেবাতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। ওই আগুনের সঙ্গে লড়াই করে যে-মানুষগুলো বেঁচে রইল, তাদের সে কি কান্না! সে কি হাহাকার! আমি দেখতে পারি না সে দৃশ্য। আমারও চোখ উপচে গেল। আমি দেখতে পেলুম, ছেলের জন্যে মা কাঁদছে। মায়ের জন্যে মেয়ে কাঁদছে। মেয়ের জন্যে বাবা কাঁদছে। সে যেন এক কান্নার দেশ। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। ওদের সামনে থেকে পালাতে পারলেই যেন আমি বাঁচি। হ্যাঁ, আমি পালাব, এখনই, এখান থেকে।

কিন্তু ওই যে শত-শত মুমূর্ষু মানুষ, ওই যে আগুনে ঝলসানো হাজার-হাজার মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, তাদের কী হবে? এই মুহূর্তে আমি ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু ওই তো তারা তাদের অগুনতি হাত আকাশে বাড়িয়ে আমার দিকেই ছুটে আসছে। তারা বলছে, "হে সম্রাট, এই ধ্বংসের মধ্যে আমাদের ফেলে আপনি যাবেন না। আপনি আমাদের দেবতা।"

তাদের সেই আর্তনাদ শুনে আমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যেন ভেঙে গেল। লজ্জায় অনুতাপে আমি আর কথা বলতে পারি না। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, আমি বোধ হয় এখন পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য ঘাতক।

আমার মাথা নত। আমার গলায় কান্না। আমি শান্তসুরে বললুম, "হে আমার প্রিয় দেশবাসী, আমি না-জেনে যে কাজ করে ফেলেছি, তার জন্যে আমার দুঃখের শেষ নেই। আমার যে-হাতে ওই আগুন জ্বলেছে, আমি তোমাদের আশ্বাস দিচ্ছি, সেই হাতেই আমি তোমাদের সব ফিরিয়ে দেব। ফিরিয়ে দেব তোমাদের ঘর-বাড়ি, টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, সবকিছু। শুধু একটি অনুরোধ আমার তোমাদের কাছে, আমার এই নিষ্ঠুর কাজের জন্য আমাকে তোমরা ক্ষমা কোরো।"

আমার আশ্বাস শুনে সেই আগুনে ঝলসানো মানুষগুলো নিশ্চুপ

হয়ে গেল নিমেষে। এত হাহাকার, এত কান্না নিস্তব্ধ হয়ে গেল চকিতে। আকাশে তোলা হাতগুলি তাদের নিঃশব্দে নেমে এল। মাটিতে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারা। আমার রথ ছুটল রাজধানীর পথে, আমার প্রাসাদে।

প্রাসাদে ফিরেও স্থির থাকতে পারলুম না আমি। কেমন যেন একটা অজানা ভয়ে আমি কুঁকড়ে আছি। বারবার আমার মন বলছে, যেন আর এক কোনো সাংঘাতিক বিপদ আমায় হাতছানি দিচ্ছে। কিন্তু কী সে বিপদ, আমি ভেবে পাই না। ভাবতে-ভাবতে শুধু ছটফট করি।

দুই

অজানা ভয়ে ভরা এই ভাবনা নিয়েই রাতে আমি শুয়ে পড়েছিলাম আমার সোনার খাটে। আমার ঘরের দেওয়ালে খোদাই করা কত-না মূর্তি শোভা পাচ্ছে। চমৎকার! সেই মূর্তিগুলি দেখছি আর ক্লান্ত দেহটা নিয়ে এ-পাশ ও-পাশ করছি। ঘুম আসে না। ঘুম পাচ্ছে না। যেন বারবার কানে-কানে বেজে উঠছে সেই অসংখ্য লোকের কান্না। কাঁদতে-কাঁদতে তারা বলছে, "আমরা কোনো দোষ করিনি সম্রাট, আমরা কোনো দোষ করিনি।"

হ্যাঁ, ওদের সম্রাট আমি। ওরা জানে, সম্রাট দেবতারই জীবন্ত রূপ। সম্রাটকে অবজ্ঞা করা মানে দেবতাকে অপমান করা। কিন্তু আমি ভাবছি, এ কেমন দেবতা আমি! যারা আমায় পুজো করে, তাদেরই আমি পুড়িয়ে মারি!

এমনি যত হাজারো ভাবনা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কখন।

ঘুমোতে-ঘুমোতে এক সময়ে হঠাৎ আমার বুকটা ভীষণ ভয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠেছিল। আমি চমকে গেছি। আমার ঘুম-ছোঁয়া

চোখের ভেতর যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি! মনে হল, আলোর ফুলকিগুলি যেন চারিদিকে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে ঢেউ তুলছে। সেই ঢেউগুলির তালে-তালে কে যেন বাজনা বাজায়। সেই বাজনায় যখন ঝংকার উঠল, তখন আমি দেখলুম, সেই আলোর ঢেউয়ে দোলা খেতে-খেতে একটি মূর্তি আমার চোখের সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমার চিনতে বাকি রইল না, ইনি কে! ইনিই আমাদের সঙ্গীত, শিল্প আর বিদ্যার দেবতা! এঁর নাম, 'থথ'। দেবতা 'থথে'র দেহটা দেখতে বনমানুষের মতো। তাঁর মাথাটা সারসের। তাঁর হাতে একটি সারস-পাখির পালক। তিনি গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, "সম্রাট, আমাকে বোধ করি তুমি চিনতে পেরেছ! আমি দেবতা 'থথ'। তুমি অহংকারে অন্ধ হয়ে যে নির্দয় কাজ করেছ, তাতে আমার কষ্টের শেষ নেই। আমি তাই তোমার কাছে এসেছি। সম্রাট, সূর্য-দেবতা 'রে'-র দয়ায় তুমি আজ সিংহাসনে বসেছ। কিন্তু তুমি যে এমন অত্যাচারী হয়ে উঠবে, সে-কথা তিনি জানলে হয়তো এই পৃথিবীতে তোমার জন্মই হত না। তুমি কি জানো, তোমারই অত্যাচারের আগুনে আমার কী ক্ষতি হয়েছে। আমার এক শ্রেষ্ঠ সন্তান আজ গান গাইতে ভুলেছে। আমি আমার সঙ্গীতের সব সম্পদ যার গলায় উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলুম, আমার সেই শ্রেষ্ঠ সন্তান একটি ছোট্ট মেয়ে। তার নাম জুয়াম। হে সম্রাট, সে যখন গান গায়, সে-গান শোনার জন্য ওই আকাশ-স্বর্গের দ্বার খুলে আমি পৃথিবীতে নেমে আসি। আমি নেমে আসি ফুলের মধ্যে। সে-গানের সুরে-সুরে কুঁড়িগুলি ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। নীলনদের ঢেউগুলি ফুলে-ফুলে দুলে ওঠে। রঙিন পাখি খেলতে-খেলতে অবাক হয়ে থমকে ওঠে। হে সম্রাট, তাকে আমি এমন শক্তি দিয়েছি, তার গানে শুকনো মরুতে বৃষ্টি নামে। দুঃখের ঘরে সুখের আলো জ্বলে। সে ছিল তার মা আর বাবার একমাত্র সন্তান। বয়েসের ভারে তাদের কাজ করার ক্ষমতা ছিল না। তাই ওই ছোট্ট মেয়ে জুয়াম বাবা-মাকে



দেখত। প্রাণ ঢেলে তাদের সেবা করত। জুয়ামের কষ্ট দেখে যেদিন ওর মা আর বাবার চোখগুলি কান্নায় ভরে যেত, কাঁদতে-কাঁদতে যেদিন জুয়ামকে বুকে নিয়ে বলত, আমরা যখন থাকব না, তুই কার কাছে থাকবি জুয়াম, সেদিন জুয়ামেরও চোখ ফেটে জল পড়ত। বুড়ো মা-বাবাকে জড়িয়ে ধরে সে বলে উঠত, না, না, তোমাদের আমি যেতে দেব না। কোনো দিনও না।' তারপর গান শোনাত জুয়াম মা আর বাবাকে। গান শোনাত নিঃঝুম রাতের অন্ধকারে। সে-গান শুনতে-শুনতে তারা ঘুমিয়ে পড়ত।

"হে সম্রাট, আজ তোমার অত্যাচারের আগুনে জুয়ামের মা-বাবার মৃত্যু হয়েছে। জুয়াম পারেনি তার বাবা-মাকে বাঁচাতে। পারেনি বলেই, সে ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের। সে ভুলে গেছে গান গাইতে। তার গানের সুর থমকে থেমে গেছে গলায়। সম্রাট, তোমার আগুনে একটি সুন্দরকে তুমি পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছ। তুমি পাপী।

"তুমি শুনে রাখো সম্রাট, তোমার পাখিকে কেউ বন্দীও করেনি, হত্যাও করেনি। সে যেমন ছিল, তেমনই আছে। সেদিন জুয়াম যখন তার মা আর বাবাকে গান শোনাচ্ছিল, সে-গান শুনতে পেয়েছিল পাখিটি। উড়তে-উড়তে সে চমকে গেছল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপর জুয়ামের গলার সেই গানের রিনিঝিনি সুর শুনতে-শুনতে সে-ও গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠে। গান গায় আর রঙিন ডানা দুটি তার নেচে-নেচে দোল খায়। সেই-যে পাখি, ছোট্ট পাখি, জুয়ামের সঙ্গে সে পাতাল মিতালি। সে জুয়ামের গান শোনে, নিজে গায় আর খেলা করে। সম্রাট, তোমার পাখি তোমার চেয়ে ভালবেসেছিল জুয়ামকে, তার গানকে। তাই সে আজ জুয়ামের খেলার সঙ্গী।

"সম্রাট, যে পাপ করে, পাপের শেষ তাকেই করতে হয়। আমি 'প্রথ'। আমি পৃথিবীকে আনন্দে ভরিয়ে রাখতে চাই। কিন্তু তুমি আমার সেই ইচ্ছায় বাধা দিয়েছ। তাই তোমাকে আদেশ করছি,

ওই ছোট্ট মেয়েটিকে তুমি তোমার প্রাসাদে নিয়ে এসো। তুমি যেমন করে পারো তার গলায় আবার গানের সুর ফিরিয়ে আনো। তার গান আবার না শুনতে পেলে আমার শান্তি নেই। আমি শান্তি না-পেলে, জেনে রাখো সম্রাট, তোমার ধ্বংস নিশ্চিত!"

আমার আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ আঘাত লাগলে যেমন ধাঁধা লেগে যায় চোখের তারায়, ঠিক তেমনি আমার চোখেও ধাঁধা লেগে গেল। আমি হতভম্বের মতো চেয়ে-চেয়ে দেখছি ঘরের এ-পাশ, ও-পাশ। দেখতে পাচ্ছি না কিছুই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, 'থথ'-এর সেই গলার কঠিন স্বর যেন এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে। বুঝি-বা 'থথ'-এর নিশ্বাসের শব্দ আমার কানে বাজছে। আমার মনে হচ্ছিল, 'থথ'-এর সেই মূর্তিটা ঘরের অন্ধকারে ছায়ার মতো আমার দিকে তাকিয়ে আছে! তার বনমানুষের দেহের দু-পাশে ঝুলন্ত হাত দুটো আমার গলাটা টিপে ধরবে বলে বুঝি-বা ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে! তার সারসের মতো মুখের ভেতর থেকে লাল টকটকে জিবটা লকলক করছে! আমায় বুঝি কামড়ে দেবে! আমি বিষম ভয় পেয়েছি। ধড়ফড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছি। কাঁপছি আমি। চিৎকার করে উঠলুম প্রচণ্ড জোরে! কিন্তু অবাক কাণ্ড, আমার গলা দিয়ে এক ফোঁটা স্বর বেরোল না। আমি যেন বোবা এই মুহূর্তে!

বাকি রাতটা যে কী কষ্টে কেটেছে আমার সে তোমরা ধারণা করতে পারবে না। সারারাত ছটফট করেছি আর আকাশে দেখেছি দিনের আলো ফুটল কিনা!

সকাল হতেই আমি আমার প্রিয় দূতকে ডেকে পাঠালুম। তাকে আদেশ করলুম, "তুমি এখনই যাও। যে-আগুনে ধ্বংস হয়েছে আমার পশ্চিমদেশ, যে-আগুনে প্রাণ গেছে অনেক মানুষের, সেইখানে এখনও যারা বেঁচে আছে, তাদের মধ্যে জুয়াম নামে একটি ছোট্ট মেয়ে কেঁদে-কেঁদে তার মা আর বাবাকে খুঁজছে। সেই আগুন তার মা

আর বাবাকেও গ্রাস করেছে। হে আমার প্রিয় দূত, তুমি যেমন করে পারো তাকে আমার প্রাসাদে নিয়ে আসবে। তাকে বলবে, সম্রাট তার জন্যে প্রাসাদের সিংহদুয়ারে অপেক্ষা করছেন। সে ছোট্ট। তাই তার জন্যে তুমি একটি ছোট্ট সোনার রথ নিয়ে যাবে। সেই সোনার রথ টানবে ছ'টি ঘোড়া। সেই সোনার রথের মতো সেই ঘোড়াগুলির গায়ের রঙও যেন হয় সোনালি। তুমি সেই ছোট্ট মেয়ে জুয়ামকে বলবে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট তাকে আদর জানিয়েছেন। বলবে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর সেই ছোট্ট মেয়ে জুয়ামের সোনার কণ্ঠের সোনালি গান শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন।"

সকালের সূর্যের আলোয় সোনার রথে জোতা ছয় ঘোড়া আমার প্রিয় দূতকে নিয়ে টগবগিয়ে ছুটে গেল। আর আমি ছুটে গেলুম সেই সোনার মন্দিরে। যে-মন্দিরটি 'থথ'-এর। আমি তাঁর মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। স্থির চোখে দেখতে লাগলুম দেবতাকে। তারপর ধীরে অস্পষ্ট গলায় প্রার্থনা করলুম, "হে স্বর্গের দূত, হে সঙ্গীতের দেবতা, আমি আমার অজান্তে যে-কাজ করে ফেলেছি, তার জন্যে তুমি আমায় ক্ষমা করো। হে 'থথ', আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার শ্রেষ্ঠ সন্তান জুয়াম নামে সেই ছোট্ট মেয়েটিকে আমার প্রাসাদে নিয়ে আসব। আমি কথা দিচ্ছি, আমার সমস্ত আদর দিয়ে, সমস্ত স্নেহ উজাড় করে তার বাবা-মার অভাব ঘোচাব। হে দেবতা, আমি যেমন করে পারি তার গলায় আবার গানের সুর ফিরিয়ে আনব। আর তা যদি না পারি, হে 'থথ', ওই সিংহাসন আমি তুচ্ছ করে সম্রাটের মুকুট খুলে ফেলে আমি পথে-পথে ঘুরে বেড়াব। তখন যদি ইচ্ছা হয়, তুমি আমায় ধ্বংস কোরো। তখন আমার দুঃখ করার কিচ্ছু থাকবে না। সে-শাস্তি আমি আনন্দের সঙ্গে মাথা পেতে নেব।"

তিন

আমি ভেবেছিলুম, আমার দূত এরই মধ্যে ফিরে আসবে। কারণ, ফিরে আসার সময় তার বয়ে গেছে। কী অধীর আগ্রহে আমি অপেক্ষা করছিলুম সে তো তোমরা বুঝতেই পারছ। প্রতিটি মুহূর্তে আমি সময় গুনছি। আর ভাবছি, এই বুঝি আমার প্রিয় দূতের সঙ্গে জুয়াম নামে ছোট্ট মেয়েটি এসে পড়ে!

কিন্তু না, আসেনি। আসেনি চার দিন কেটে যাবার পরেও। আমি ভাবলুম, তবে কি আমার দূত এখনও তাকে খুঁজে পেল না! আমি কী করব আর কী না-করব কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। যেন একটা না-জানা ভয় আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। আমি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। তখনই ভাবলুম, তবে কি আর কাউকে পাঠাতে হবে দূতের খোঁজ নিতে!

না, পাঠাতে হল না। কেননা, আমি আমার মন্ত্রগুপ্তির ঘরে যখন বসে আছি, তখন বাইরে হঠাৎ একটা ভীষণ গোলমাল শোনা গেল। আমি জানলার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখি, অনেক মানুষ গোলমাল করতে-করতে ছুটে আসছে প্রাসাদের দিকে। দেখতে পেলুম, তারা কাকে যেন ধরাধরি করে নিয়ে আসছে এদিকেই, প্রাসাদের ভেতর। আমি আরও ভাল করে দেখার জন্যে আমার চোখের দৃষ্টি স্থির রেখেছি। তারা প্রাসাদের সিংহতোরণ পেরোবার সঙ্গে-সঙ্গে দেখি, একী, এ যে আমার প্রিয় দূত! কী হয়েছে আমার দূতের! অমন করে কোথা থেকে নিয়ে আসছে ওরা!

আমার দূত অজ্ঞান হয়ে আছে। হঠাৎ ওকে দেখতে পাওয়া গেছল নীলনদের তীরে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিল। হয়তো জলের স্রোতেই ভেসে এসেছে। কিন্তু কেমন করে যে ভেসে এসেছে, কেউ

বলতে পারে না। যে-মানুষটা ওকে তীরের ওপর প্রথম দেখতে পায়, সে ওকে চিনতে পারে। চিনতে পেরে চিৎকার শুরু করে দেয়। তার চিৎকারে সবাই যখন ছুটে আসে, তখন তার জ্ঞানই ছিল না।

অনেক চেষ্টা করে আমার দূতের জ্ঞান এসেছিল। সে বাঁচল। কিন্তু ভয়ংকর আতঙ্কে এমন আঁতকে আছে যে দেখে আমার নিজেরই কেমন যেন ভয় হল। অনেক চেষ্টার পর তার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারলুম। তাকে যখন জিজ্ঞেস করলুম, "কী করে তোমার এ-অবস্থা হল আমার প্রিয় দূত ?" সে-কথা শুনে ভীষণ ভয়ে সে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল। আমি অবাক হয়ে ভাবলুম, তাই তো, দূত এমন করে কাঁদে কেন ? তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলুম, "কী হয়েছিল তোমার ? নীলনদের জলস্রোতে তুমি ভেসে এলে কেমন করে ?"

ঠিক এই সময়ে আমি তার চোখ দুটি দেখে বুঝতে পারলুম, সে-চোখ ভয়ে যেন কুঁচকে আছে। মনে হচ্ছে, বুঝি-বা তার সামনে একটা ভয়ংকর কিছু মুখ ভেংচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! তার ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপছে। আমি বললুম, "দূত, তোমার সামনে আমি সম্রাট দাঁড়িয়ে আছি। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই। বলো, কে তোমার এ-অবস্থা করল! জানতে পারলে, তাকে শাস্তি দিতে পিছপা হব না।"

হয়তো আমার এই আশ্বাস শুনে আমার দূত অনেকটা আশ্বস্ত হল। তবু সহজ হতে পারল না তখনও। সন্দেহে তার চোখ দুটি তখনও ছটফট করছে। কিন্তু কথা বলল দূত। চুপিসারে ধরা-ধরা গলায় বলল, "তারা ? তারা কোথায় ? তারা যদি শুনে ফেলে! না না, আমি বলতে পারব না!"

আমি চমকে উঠলুম। দূতের হাত দুটি চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলুম, "কে ? কে তারা ?"

"তারা বীভৎস!" বলেই নিজের চোখ দুটি বুজে ফেলল দূত।

আমি বললুম, "কেমন দেখতে তাদের ?"

"তারা মানুষ নয়।"

"তবে ?"

"মানুষের চেয়ে ভয়ংকর তাদের দেখতে।"

"আর ?"

"জানি না।"

"ভাল করে মনে করে ছ্যাখো !"

"বলতে পারব না। শুধু মনে আছে, আমার ছয় সোনালি ঘোড়া যখন সোনার রথ নিয়ে ছুটে চলেছিল জুয়ামের খোঁজে, তখন আচমকা এক ঘন কুয়াশায় আকাশ ঢেকে গেছল। আমি প্রকৃতির এই হঠাৎ খেয়ালিপনায় হকচকিয়ে গেছলুম। আমার সহিসকে আমি আদেশ করলুম, 'রথ থামাও।' কিন্তু আশ্চর্যের কথা, শত চেষ্টাতেও আমার সহিস আমার রথের ছয় ঘোড়াকে থামাতে পারল না। তারা কদম-পায়ে দ্বিগুণ জোরে ছুটতে আরম্ভ করে দিল। আমার সহিস যতবার চেষ্টা করছে তাদের থামাতে অথবা সামনের পথে নিয়ে আসতে, তারা দেখি ততবারই যেন উলটো পথে লাফিয়ে ছুটছে। শেষমেশ ওই অবাধ্য ঘোড়ার পিঠে সহিস প্রচণ্ড জোরে চাবুক মারতে লাগল। আপনাকে বলব কী, তখন সেই ছয় ঘোড়ার গলা-ফাটানো সে কী উদ্ভট চিৎকার! চিৎকার করতে-করতে দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে কোথায় যে তারা ছুটে চলল, আমি তা নিজেও ঠাওর করতে পারলুম না। আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেলুম। আমার হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে এল। আমার মনে হল, হয় ঘোড়াগুলোকে কেউ জাদু মেরেছে, না-হয় ভয়ংকর কিছু দেখে বাঁচার জন্যে পালাবার পথ খুঁজছে। নইলে এমন পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটবে কেন! এমন-কী সামনে যে অমন নীলনদের অতল জল, সেদিকেও তাদের খেয়াল রইল না। হুড়দাড়িয়ে ছুটতে-ছুটতে হুড়মুড় করে অতল জলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল! ঠিক সেই সময় কারা যেন ঠিক আমার পেছনে বিচ্ছিরি গলায় খেঁকিয়ে-খেঁকিয়ে হেসে উঠল। আমি পেছন ফিরে চেয়ে দেখি, কী বীভৎস চেহারা তাদের! তাদের চোখগুলো কোটরে-কোটরে

শুকিয়ে ঢুকে আছে। মুখের মাংসগুলো আগুনে পোড়া আর ঝলসানো! হাত-পাগুলো ছায়ার মতো ল্যাকপেকে। তারা কারা বুঝতে না-বুঝতেই সম্রাট আমি জলের তলায় তলিয়ে গেলুম। তারপর আর কিচ্ছু জানি না।"

থামল আমার দূত। আমি দেখলুম, আতঙ্কে তার বুকটা ধক ধক করে কাঁপছে। আমি বললুম, "দূত, তোমার কিচ্ছু ভয় নেই। সম্রাট তোমার সহায়। কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি যাও। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো। আমি দেখছি, কী করতে পারি।"

দূত চলে গেল। আমারও যেন অজান্তে একটা ভয় মনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। অবশ্য এটা বুঝতে দিলুম না কাউকে। কেননা, সম্রাটের ভয় পাওয়ার কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেলে, যারা সম্রাটের ওপর নির্ভর করে আছে তারা দাঁড়ায় কোথায়! না-হয় ভয়ের কথাটা গোপনই রাখলুম, কিন্তু কে তারা? কারা সেই ভয়ংকর জীব? কোনো মানুষের ছদ্মবেশ, না, অন্য কিছু? এ কি কোনো পিশাচ! যাই হোক, আমি সম্রাট। আমার পরাজয় মানায় না। ভীরুর মতো লুকিয়ে বসে থাকা আমার সাজে না। সুতরাং সেই অজানা আর ভয়ংকর জীবগুলোকে আমায় খুঁজে বার করতে হবে। এ-কথা যদি সত্যি হয়, এরা জুয়ামকে প্রাসাদে নিয়ে আসতে দেবে না, তবে এ-কথাও তারা জেনে নিক, তাদের আমি ধ্বংস করব। জুয়ামকে আমার চাই-ই চাই। সুতরাং আমি আমার সেনাপতিকে তলব করলুম। সেনাপতি ছুটে এলেন।

"সম্রাট, আমায় ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ সেনাপতি।"

"আজ্ঞা করুন।"

"আপনি জানেন আমার সোনালি ছ' ঘোড়া সোনার রথে আমার দূতকে নিয়ে ছুটেছিল জুয়াম নামে একটি ছোট্ট মেয়েকে আমার কাছে

নিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু সেনাপতি, কে বা কারা আমার সোনালি ছয় ঘোড়া আর সোনার রথ ওই নীলনদের জলে ডুবিয়ে দিয়েছে। সেনাপতি, যারা আমার রথ জলের তলায় ডুবিয়ে দিয়েছে, তাদের যেমন করে হোক ধরে আনতে হবে। আর খুঁজে আনতে হবে সেই ছোট্ট মেয়ে জুয়ামকে, যেখান থেকে পারো।"

"জো হুকুম।"

আমি আরও বললুম, "কাজটা খুবই জরুরি।"

সেনাপতি বললেন, "তিনদিনের মধ্যে আপনার হুকুম তামিল না করতে পারলে আপনার শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব।"

"খুশি হলুম।"

সেনাপতি চলে গেল।

পরের দিনই সকালে আমার আদেশমতো সেনাপতি তাঁর বিশ্বস্ত আরও পাঁচজন সৈনিক নিয়ে অপরাধীদের খুঁজতে বেরিয়ে গেলেন। এবং তাঁরা যে কোথায় গেলেন এবং কোন্ পথ দিয়ে গেলেন এ-খবরটা কেউ জানতেও পারল না। আমি অত্যন্ত উদ্গ্রীব হয়ে তাঁদের অপেক্ষায় রইলুম। যদিও আমি জানি, সেনাপতির মুখের কথা শুধু কথার কথা নয়, সেনাপতি যা বলেন তার নড়চড় হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তবুও কেমন যেন একটা অকারণ ভয়ে আমার মনটা ভার হয়ে রইল। ভয়টা অকারণই। কারণ কে না জানে সম্রাটের শক্তির কাছে সব শক্তিই তুচ্ছ।

আমি আবার ভাবতে বসলুম সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা। ভাবতে বসলুম, ওই ছোট্ট মেয়েটিকে খুঁজতে গিয়ে আমার প্রিয় দূতের কেন এই বিপদ! মিথ্যে অকারণে তো কেউ কারো ক্ষতি করে না। কিন্তু তারা কে? কে আমার প্রিয় দূতকে এমন করে হেনস্থা করল? তারা কি চায়নি ওই জুয়াম নামে ছোট্ট মেয়েটিকে আমি আমার প্রাসাদে নিয়ে আসি? না কি, আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায় তারা! হয়তো বা আমার অত্যাচারের আগুনে তাদেরও সব ধ্বংস হয়েছে।

কিন্তু তাই বলে তারা মানুষের চেয়ে ভয়ংকর কেন হবে দেখতে ? তবে কি আগুনে তাদেরও মৃত্যু হয়েছে ! তবে কি মৃত-মানুষের আত্মা তারা ! আমি ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেলুম।

হ্যাঁ, আমি সত্যিই ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেছি। কেননা, আজ তিন দিন কেটে গেল, সেনাপতি এলেন না। এমন-কী ফিরল না পাঁচ জন সৈনিকের একজনও। সৈনিক কখনও কর্তব্যে অবহেলা করে না। বিশেষ করে, আমার সেনাদলকে আমি খুব ভালভাবে চিনি। আমি এও জানি, আমার সেনাপতি আমার হুকুম তামিল করার জন্যে প্রাণকে তুচ্ছ মনে করেন। সেই কারণে তিন দিনের মধ্যে তাঁদের ফিরে না-আসার কারণটা আমায় ভীষণ ভাবিয়ে তুলল। কেমন একটা অদ্ভুত রহস্যের মতো মনে হতে লাগল সবকিছু। তবু আরও দু-একটি দিন অপেক্ষা করার ইচ্ছা ছাড়লুম না। আশা, নিশ্চয়ই ফিরবে। কে না জানে, বাধা-বিপত্তির মধ্যে কাজ করতে গেলে সময় নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না ! সুতরাং সব কথাই সবার কাছে গোপন রেখে আমি মুখ বুজে অপেক্ষাই করতে লাগলুম।

না, তাঁরা এলেন না। কেউ জানে না কোথায় আছেন তাঁরা। কেউ দিতে পারল না কোনো খোঁজ, কোনো খবর। তবে কি তাঁরাও কোনো বিপদে পড়লেন ! তাঁরাও কি নীলনদের জলের গভীরে ডুবে গেলেন ! ভাবতে-ভাবতে শিউরে উঠলুম। তবে কি সম্রাট পরাজিত হল !

না, আমি হারতে জানি না। এ-রহস্য আমায় খুঁজে বার করতেই হবে। মানুষ কখনও রহস্যের কাছে হার স্বীকার করে না। তার ওপর আমি সম্রাট। একটা নগণ্য ভয়ের কাছে মাথা হেঁট করব আমি ? আমার এত শক্তি, এত অস্ত্র। এত রসদ, এত সম্পদ। এ-সবের কি কোনো মূল্যই নেই ! না না, জুয়ামকে আমি ফিরিয়ে আনবই। দেবতা 'থথ'-এর আদেশ আমি মাথা পেতে নিয়েছি। সুতরাং সে-আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে।

কিন্তু কেমন করে ? এই কথাটাই আজ সারাদিন আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। এই ভাবনা মাথায় নিয়ে রাত্রে নিঃশব্দে শুয়ে-শুয়ে কত কল্পনাই আমি করেছি। আমার ঘরে ওই যে জ্বলন্ত আলোর শিখাটি, ওই যেন এখন আমার একমাত্র বন্ধু। খোলামেলা আকাশের ফুরফুরে বাতাস মাঝে-মাঝে ওই রেশমি পর্দায় ঢেউ তুলে ঘরের মধ্যে লুটোপুটি খাচ্ছে। আমি দেখছি একমনে। ওই পর্দাগুলো উড়তে-উড়তে এক-এক সময় চোখের ওপর এমন ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে যে, দেখলেই মনে হচ্ছে, যেন আকাশ থেকে সুন্দরী উপদেবীরা নেচে-নেচে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আবার এক-এক সময় মনে হচ্ছে পর্দাগুলো যেন মেঘের ছায়া। কখনও কখনও হাওয়ার স্রোতে এমন জড়িয়ে যাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে, সারা অঙ্গে একফালি সাদা ধবধবে কাপড় জড়িয়ে যেন এক প্রেতাত্মা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চমকে যাই আমি। গা ছমছমিয়ে ওঠে!

ওই ফুরফুরে বাতাসের মাথা ডিঙিয়ে হঠাৎ এমন একটা দমকা হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল যে, আমি হতচকিত হয়ে গেছি। ঝন-ঝন-ঝনাত ! একটা ফুলদানি ভাঙল বোধহয় ! ঘরের বাতিটাও ঝট করে নিবে গেল। জমাট অন্ধকার ! এ কী ! অন্ধকারের সঙ্গে একাকার হয়ে আমার সামনে ও যেন কে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বুকের ভেতরটা থমকে এই বুঝি থেমে যায় ! আমার নিশ্বাস আটকে আসছে ! তার দিকে আমি তাকিয়ে আছি ! উঃ ! সে কী ভয়াবহ দৃশ্য ! আমি তার মুখখানা দেখতে পাচ্ছি না। কেননা, তার সারা মুখখানা একটা কাপড়ে ঢাকা ! শুধু তার একটি কোটরে-চোখ কাপড়ের আড়াল থেকে পিটপিট করছে। মনে হল, সে নিঃসাড়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি আর নিজের সাহসকে বুকের মধ্যে বেঁধে রাখতে পারলুম না। আঁতকে চিৎকার করে উঠলুম, "কে-এ-এ-এ ?"

সে যেন আমার চিৎকার শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ফিসফিসিয়ে



সেও বলে উঠল, "না-আ-আ! অমন করে চিৎকার করবেন না সম্রাট। একটু পরেই আপনি জানতে পারবেন আমি কে।"

আমি উত্তেজনায় তেমনি হাঁপাতে-হাঁপাতে বললুম, "এখুনি বলো, কে তুমি?"

সে বললে, "সম্রাট, যদি ভয় না পান বলতে পারি।"

তার কথা শুনে ভয়টাকে মনের মধ্যে চেপে ধরে বললুম, "ভয় আমি পাই না।"

"বেশ! তবে শুনুন সম্রাট, কদিন আগে পর্যন্ত আমি একজন জীবন্ত মানুষ ছিলুম। আজ আমি মৃত।"

আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলুম। আমার গলার স্বরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমি কাঁপতে-কাঁপতে তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি আমার ঘরে ঢুকেছ কেন?"

সে তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বলল, "অনেক কথা আছে। আপনাকে আমার অনেক কিছু বলার আছে।"

"যে-মানুষ মৃত, তার আবার কথা কী থাকতে পারে?" ভয়-জড়ানো কণ্ঠে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"আছে, সম্রাট, আছে। বিশ্বাস করুন, মৃত-মানুষেরও অনেক কথা থাকে। কিন্তু তারা বলতে পারে না। কেননা, কেউ তাদের কথা শোনে না। সবাই ভয় পায়।"

"বেশ, সে-কথা তাড়াতাড়ি বলো। বলে যত তাড়াতাড়ি পারো, এখান থেকে চলে যাও।"

সে বললে, "সময় আমারও কম। আমি তাড়াতাড়িই বলছি। সম্রাট, আমরা সেদিন অবধি বেঁচে ছিলুম। আমি, আর আমার বউ। কিন্তু আপনার যুদ্ধের আগুনে পুড়ে আমাদের জীবন শেষ হয়ে গেছে। ঠিক কথা, বয়েসের ভারে আমরা অথর্ব হয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের কাজ করার কোনো ক্ষমতাই ছিল না। আমরা পা বাড়িয়ে বসে-বসে দিন গুনছিলুম। তবু, সম্রাট, আমরা আর কটা দিন

বাঁচতে চেয়েছিলুম। চেয়েছিলুম আমাদের সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা ভেবে। কিন্তু তা হল না।

"মেয়েটি!" আমি থতমত খেয়ে গেছি। জিজ্ঞেস করলুম, "কে তোমাদের মেয়ে?"

"সম্রাট, যাকে আপনার প্রাসাদে নিয়ে আসার জন্যে দূত পাঠালেন, সেনা পাঠালেন।"

"তোমার মেয়ের নাম জুয়াম?"

সেই মৃত-আত্মা যেন চাপা-কান্নায় ডুকরে উঠল, "জুয়াম, জুয়াম, আমাদের বুকের ধন, চোখের মণি জুয়াম। আহা! সে আমাদের গান শোনাত। সে আর আমাদের গান শোনাবে না—সম্রাট, আর কোনোদিনই শোনাবে না।"

আতঙ্কে আমি এতক্ষণ কুঁকড়ে ছিলুম, এবার যেন সেই ভয় আমার ওই মৃত-আত্মার কান্নার শব্দে মুছে গেল।

আবার আকুল কণ্ঠে বলে উঠল সেই মৃত-আত্মা, "আহা! এই বুড়ো বাপ-মাকে খুশি রাখার জন্যে কী না করেছে আমাদের ওই ছোট্ট মেয়ে জুয়াম। কত যত্ন, কত আত্তি। তার কষ্টের কি শেষ ছিল! কিন্তু বুঝতে দিত না আমাদের কিছুতেই। তার হাসিমাখা মুখখানি দেখে দুঃখে-ভরা মন দুটি খুশিতে উছলে যেত! আহা। সে-গান, গান নয়, যেন স্বর্গের দুয়ার খুলে সুধা ঝরে পড়ছে! সম্রাট, আমাদের সেই মেয়েকে ওরা বাঁচতে দেবে না।"

আমি চমকে উঠলুম। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "কারা বাঁচতে দেবে না?"

সে উত্তেজিত হয়ে বললে, "যারা আপনার দূতকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। যারা আপনার সোনার রথ নীলনদে ডুবিয়ে দিয়েছে। যারা আপনার সেনাদলকে মাটির গহ্বরে ফেলে পাথর চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে!"

আমার ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তারা কারা?"

সে বললে, "সম্রাট, তারা আপনার যুদ্ধের আগুনে পুড়ে মরেছে। তারা মৃত। ভয়ংকর হিংস্র আত্মা। তারা এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চায়। তারা চায় আপনার প্রাণ নিতে। তারা জানে আপনি জুয়ামকে প্রাসাদে নিয়ে আসতে চান। তাই তাদের আক্রোশ আরও তীব্র হয়েছে। আপনি যাতে জুয়ামকে প্রাসাদে আনতে না পারেন, তাই তারা জুয়ামকেও মেরে ফেলতে চায়। আমি জানি সম্রাট, তারা কিছুতেই জুয়ামকে প্রাসাদে আসতে দেবে না। যারা তাকে প্রাসাদে আনার চেষ্টা করবে, তারা প্রাণে বাঁচবে না। এই সব মৃত-মানুষের হাতে তাদের নিশ্চিত মরণ! সম্রাট, অনেক চেষ্টা করে, লুকিয়ে-ছাপিয়ে আপনার কাছে এই খবরটা আমি জানাতে এসেছি। আর বলতে এসেছি, আপনি আমার মেয়েকে বাঁচান। সে না-বাঁচলে আমরা শান্তি পাব না, কোনোদিনও না।"

এই কথার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ আমার মনে হল, এতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে ছিল আমার চোখের সামনে, তারই ছায়াটা যেন ভীষণ ছটফট করতে-করতে দেওয়ালের গায়ে-গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। ছড়িয়ে-ছড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "সম্রাট, আপনি আমার মেয়েকে না বাঁচালে, কে বাঁচাবে? কে বাঁচাবে? কে বাঁচাবে?" বলতে-বলতে সেই ছায়া যে কোথায় হারিয়ে গেল, আমি আর দেখতে পেলুম না।

মৃত সেই বৃদ্ধের কথা শুনে আমার মনের মধ্যে এক আশ্চর্য তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। আমার অন্ধকার সেই ঘরে যেন মনে হচ্ছিল তার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি তখনও ঘুরপাক খাচ্ছে। আমার কেমন ঘোর লেগে গেল! মাথাটা ঝিমঝিম করছে। বুঝি-বা হাত-পা আমার অবশ হয়ে আসছে। আমি যেন টলছি। আমি কি পড়ে যাব। আমার কি ধীরে-ধীরে জ্ঞান হারাচ্ছে।

না, আমি অন্ধকারেই হাত-পা ছুড়ে উঠে পড়লুম বিছানা ছেড়ে।

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, এতক্ষণ আমি এক মৃত মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলুম। বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার বুকের ভেতরে প্রাণের শব্দটা এখনও শোনা যাচ্ছে।

অনেক কষ্টে অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে আমি ঘরের দরজাটার হদিস পেয়েছি। হাঁপাতে-হাঁপাতে বেরিয়ে এলুম বাইরে। এইখানে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম, এবার আমি কী করব!

বুকটা ঠিক এই সময়ে ধক্ করে উঠেছে। একটা আলোর রেখা যেন দেখা যায়! হ্যাঁ, ওই তো প্রহরী হাতে আলো নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। এদিকেই আসছে। তাকে দেখে, আঃ, ভারী হালকা হয়ে গেল বুকের ভেতরটা! আমি নিজেই তাকে ডাকলুম। সে ছুটে এল। আমাকে এই সময়ে ঠিক এই অবস্থায় দেখে সে যে খুবই অবাক হয়ে গেছে, সে তার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। সে হয়ত কিছু বলত, কিন্তু সম্রাটের সামনে মুখ খোলে কেমন করে! থতমত খেয়ে দাঁড়িয়েই রইল। আমিই তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "প্রহরী, প্রাসাদের সব মানুষই কি ঘুমিয়ে পড়েছে?"

"হ্যাঁ সম্রাট।"

"তা হলে তুমি আমার একটা কাজ করতে পারবে?"

"আজ্ঞা করুন।"

"আমি একটু বাইরে যাব।"

চমকে গেল প্রহরী। আমার মুখের দিকে চেয়েও সে চাইল না। শুধু অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করল, "এই গভীর রাত্রে?"

"হ্যাঁ, এখনই। তোমার···তোমার ওই হাতের আলোটা একটু ধরো। অশ্বশালার পথটা আমায় একটু দেখিয়ে দাও।"

সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার কথা বলার সাধ্য! সুতরাং প্রহরী মাথা নোয়াল। আলো দেখিয়ে আমায় অশ্বশালায় নিয়ে চলল।

আমি অশ্বশালায় পৌঁছে আমার সেই প্রিয় কালো ঘোড়াটিকে বার

করে আনলুম। তার পিঠের ওপর লাফিয়ে উঠে প্রহরীকে আবার বললুম, প্রহরী, আমি যাচ্ছি। কোথা যাচ্ছি, তা আমি এখনই কাউকে জানাতে চাই না। এ-খবরটা গোপন। তুমি শুধু সবাইকে বলবে, একটি বিশেষ কাজে আমি বাইরে গেছি। আমার কাজ সারা হলেই আমি ফিরে আসব। কেউ যেন আমার জন্যে চিন্তা না করে।

প্রহরী হতবাক হয়ে আমার কথা শুনল।

আমি আবার বললুম, "ভয়ের কিছু নেই। আমি সম্রাট, সম্রাটের কে ক্ষতি করবে? তুমি ফিরে যাও। তোমার কাজ করোগে।" বলে আমি ঘোড়ার লাগাম টানলুম। ঘোড়া ছুটল।

বুঝতেই পারছ, আমি যে-অবস্থায় শুয়ে ছিলুম, ঠিক সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়েছি। এমন কী রাতের পোশাকটা পালটাবার ফুরসত পর্যন্ত পাইনি। অত কী, পোশাক যে পালটাতে হবে, একথাটা তখন মাথাতে আসেইনি আমার। কেমন করে আসবে! কেননা, তখন আমার মাথায় একটা চিন্তাই ঘুরছে, যেমন করে হোক জুয়ামকে বাঁচাতে হবে। এটা যদি সত্যি হয় যে, যুদ্ধে মৃত সবকটা মানুষই অশরীরী আত্মার রূপ নিয়ে বিভীষিকার ছায়া ছড়ায় কিংবা সম্রাটের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়, তবে তা নিশ্চয়ই অত্যন্ত ভয়ংকর কথা। সুতরাং সেই মৃত-মানুষের আত্মাদের কবল থেকে আমি কেমন করে নিস্তার পাব, আমি এই মুহূর্তে সেই কথা ভেবে পাচ্ছি না।

আমার ঘোড়া ছুটছে। আমার মনের ভাবনা বোধহয় ঘোড়ার চেয়েও জোরে ছুটছে! তাই এতক্ষণ আমার অন্য কিছু খেয়ালই ছিল না। খেয়াল ছিল না, অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছি। আচম্বিতে খেয়াল হতেই আমি থতমত খেয়ে গেছি। তাই তো! কোথায় যাচ্ছে আমার ঘোড়া! কোন্ দিকে ছুটছে! এতক্ষণ যে-অন্ধকারটা অন্ধকার বলে মনেই হয়নি এখন যেন সেটাকে মনে হচ্ছে একটা কালো দানব। এই অন্ধকারে হঠাৎ যদি মৃত-মানুষের সব-কটা হাত একসঙ্গে

তেড়ে এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে! আমার গলার টুঁটিটা টিপে আমায় শেষ করে দেয়!

"না-আ-আ!" এ কী! আমি আচমকা এমন চিৎকার করে উঠলুম কেন! আমি উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছি যে। আমার চিৎকারের শব্দ অন্ধকারের বুকটা ফালা-ফালা করে কেটে কোনদিকে ভেসে যাচ্ছে! নিঃঝুম রাতটা সেই আর্তনাদের শব্দে বুঝি-বা কাঁপছে!

আচ্ছা, আমি কি ভয় পেয়েছি?

কে বলেছে আমি ভয় পেয়েছি? সম্রাট কখনও ভয় পায় না। আমার ক্ষমতার কাছে ভয় এগোতে সাহস করে? সাহস করবে ওই মৃত-মানুষেরা আমার সামনে আসতে? আর যদি আসে, আমি যদি গর্জে উঠে বলি, "তোমাদের সামনে এই যে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে, এ তোমাদের দেশের সম্রাট। এই সম্রাট তোমাদের আদেশ করছে হিংসার পথ তোমরা না-ছাড়লে, সর্বশক্তি দিয়ে তোমাদের শেষ করা হবে" তখন কি তারা লক্ষ্মীটির মতো গুটি-গুটি নিজের রাস্তা দেখবে না? শুনতে বাধ্য তারা সম্রাটের আদেশ। প্রেতাত্মা কি সম্রাটের চেয়ে বড়? না, সম্রাটের চেয়ে বুদ্ধিমান? হা-হা-হা! ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে প্রচণ্ড জোরে আমি হেসে উঠলুম। তারপর ঘোড়ার পেটে গোঁত্তা মেরে চেঁচিয়ে উঠলুম, "হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, হাওয়ার মতো ছুটে চল্।"

আমার ঘোড়া ছুটছে বটে, কিন্তু আজ যেন হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না! কেমন যেন মাঝে-মাঝে হোঁচট খাচ্ছে! হুমড়ি খেয়ে পড়তে-পড়তে সামলে যাচ্ছে। আমি ভাবলুম, ঘোড়ার আবার কী হল! ঘোড়ার পিঠটা জড়িয়ে ধরে তাড়া দিলুম, "হ্যাট-হ্যাট।"

এমনই সময় আমার ঘোড়া ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে লাফিয়ে উঠল চার-পা তুলে! আমি হকচকিয়ে গেছি। কে জানত, ঘোড়াটা হঠাৎ এমন পাগলামি করবে!

হ্যাঁ, হয়তো পাগলামি! কেননা, আমি যতই চেষ্টা করছি

থামাতে, ঘোড়া ততই ঠ্যাং ছুড়ে লাফায়। লাফাতে-লাফাতে কখনও ঘাড় তুলছে, কখনও মাথা নামাচ্ছে। তারপরই গলা-ফাটানো তার সে কী চিৎকার, চিঁ-হিঁ-হিঁ! আমি বুঝি তার পিঠ থেকে পড়ি! পড়তে-পড়তে বাঁচছি, বাঁচতে-বাঁচতে টাল খাচ্ছি! আর চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ধমক মারছি, "থাম, থাম!"

কিন্তু ঘোড়া থামছে না। কিছুতেই মানছে না। সে অন্ধকারে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দিয়ে আমাকে এক বিপদ থেকে আর-এক বিপদের মধ্যে ফেলে দিল।

না, আমি পারলুম না তাকে বশে আনতে। কিছুতেই সে ঠাণ্ডা হল না। উলটে হঠাৎ সামনের দুটো পা আকাশে তুলে আমাকে এমন ঝটকা মারল, যে, আমি তার পিঠ থেকে ছিটকে মাটিতে পড়লুম। ফেলে দিয়েই সে এমন লাফাতে-লাফাতে ছুটল যে, আমি তাই দেখে তাজ্জব বনে গেলুম।

ইশ! আমার এই দশা! আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলুম! ছিঃ! ছিঃ! আমি না সম্রাট!

"হি-হি-হি! সঙ্গে-সঙ্গে কারা যেন হেসে উঠল। কী বিচ্ছিরি সেই হাসির শব্দ! সত্যি বলতে কী, পড়ে গিয়ে আমার খুবই লেগেছিল। কিন্তু হঠাৎ এই হাসির আতঙ্কে আমার ব্যথা-ট্যাথা আর কিছু মনে রইল না। আমি পড়ি-কি-মরি সটান দাঁড়িয়ে পড়লুম। দাঁড়াতেই আমার চক্ষুস্থির। আমার সামনে ওরা কারা! এই গা-ছমছম অন্ধকারে ছায়া-ছায়া কিসের চেহারা! আমার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসছে। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ! আমার শুকনো গলা দিয়ে আপনা থেকে কথা বেরিয়ে এল। আমি বলে উঠলুম, "কে?"

উত্তর পেলুম না। কিন্তু মনে হল, তারা আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। একসঙ্গে অসংখ্য সেই ছায়া! মৃত-মানুষের মিছিল! কী ভয়াবহ তাদের চলার ভঙ্গি! সেই দেখে আমি হাঁপিয়ে উঠলুম। ওরা যতই এগিয়ে আসছে, আমার হাঁপ তত বাড়ছে! অন্ধকারে

বুঝতে না পারলেও এখন আমার কোনো সন্দেহ নেই, এই সেই পশ্চিম দেশ। তবে কি এরাই যুদ্ধের আগুনে মৃত সেইসব মানুষের হিংস্র আত্মা? ঠিক তক্ষুনি আমার মনটা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, আমি বাঁচতে চাই, আমি বাঁচতে চাই! আমি পিছু ফিরে ছুট দিলুম। পারলুম না। পিছনেও সেই ছায়া! আর একদল। আমি যেদিকে তাকাই, সেই দিকেই তারা। এগিয়ে আসছে! আমার কাছে। খুব কাছে। আরও কাছে! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসহায় আমি হেঁকে উঠলুম, "কী চাও তোমরা?"

আমি দেখতে পেলুম, তারা এগিয়ে আসতে-আসতে আমার গলা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর হুটহাট অন্ধকারে মিশে গেল! আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, সেই ছায়ামূর্তির গায়ে জড়ানো সাদা ধবধবে কাপড়। অন্ধকারে তারা যেন এক ঝাঁক কুহেলিকা! হ্যাঁ, আমি আবার দেখতে পাচ্ছি তাদের। দেখতে পাচ্ছি, রাতের ঘন আঁধারে ওই-যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে পামগাছের সার, তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তারা উঁকি মারছে!

আমি বুকে সাহস আনবার চেষ্টা করলুম। মানুষ যখন বোঝে তার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন বুঝি সে এমনি করেই সাহসে বুক বাঁধে! আমি বুক ফুলিয়ে তাদের উদ্দেশে বলে উঠলুম, "আমায় যদি চিনতে না পারো, শুনে রাখো, আমি সম্রাট।"

আমি দেখতে পেলুম, আমার কথা শুনে তাদের শীর্ণ দেহগুলো বাতাসে হেলে-দুলে গুমরে-গুমরে ফুলে উঠল।

আমি আবার বললুম, "কী চাও তোমরা?"

এবার তারা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, "সম্রাটের মৃত্যু!"

অমনি সঙ্গে-সঙ্গে পামগাছের পাতাগুলো খসখস শব্দে ভীষণ জোরে কাঁপতে লাগল। পাতার কাঁপুনি দেখে হয়তো সেই অশরীরী ছায়ারা খুব খুশি! কেননা, আমি শুনতে পেলুম, তাদের গলায় চাপা হাসির রেশ!

আমি তখন সত্যিই মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে। সুতরাং আমার মনে হল, মরি যদি সম্রাটের মতো মরব। এ-ভয় আমার মিথ্যা। আমি তাই আবার বললুম, "কে আমায় মারবে?"

তারা বলল, "আমরা, যেমন করে তোমার সেনাদলকে মেরেছি। যেমন করে তোমার দূতকে নদীর জলে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছি। তেমনি করে তোমাকেও মারব! আমরা জানি, জুয়াম নামে ওই ছোট্ট মেয়েটাকে তুমি এখান থেকে নিয়ে যেতে চাও। কিন্তু, সম্রাট, তুমি তাকে কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবে না। আমরা তাকে নিয়ে যেতে দেব না। আমাদের হাতে তুমি মরবে, আর মরবে ওই মেয়েটাও।"

আমি শিউরে উঠলাম। আমি বললাম, "কেন মারবে তাকে? ওই ছোট্ট মেয়েটি তো কোনো দোষ করেনি!"

তারা তখন বীভৎস সুরে চিৎকার করে উঠল, "আমরাও তো কোনো দোষ করিনি! তবে কেন তুমি আমাদের মারলে? কেন তুমি আমাদের ঘরে-ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিলে? কেন মারলে, আমাদের ছেলে-মেয়েকে? আমাদের মা-বাবাকে? তুমি সম্রাট নও, তুমি একটা নিষ্ঠুর পিশাচ! তুমি মৃত্যুর জন্যে তৈরি হও!" বলতে-বলতে সেই পামগাছের আড়াল থেকে তাদের হিংস্র মুখগুলো বেরিয়ে এল।

আমার আর কথা বলার সময় নেই। আমি কাপুরুষের মতো এখন সত্যি-সত্যি মরণের ভয়ে পালাবার জন্যে পিছু হটলাম। তারা এবার বিকট চিৎকার করে ধেয়ে এল আমার দিকে। দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম, অসংখ্য সেই মৃত-মানুষের মাঝখান থেকে আমার কালো ঘোড়াটাও আমার সামনে তীরবেগে লাফিয়ে পড়ল। আমি প্রথমটা ভেবেছিলাম, ঘোড়াটা আমার বিপদ দেখে বুঝি-বা আমায় রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু না। তা তো নয়। ঘোড়াটা যে আমায় আক্রমণ করতে লাফিয়ে উঠেছে! হ্যাঁ, আমার ঘোড়া আমায় সত্যি আক্রমণ করল। আমার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমি মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম! তোমায় কী বলি, তুমি যদি সেই সময় ঘোড়াটার 'মূর্তি' দেখতে, তোমার ঠিক মনে হত, এ-ঘোড়া আমার নয়। যেন দানো-পাওয়া একটা ভয়ংকর উড়ন্ত জানোয়ার! যখন লাফাচ্ছে, মনে হচ্ছে, একটা মারাত্মক জন্তু উড়তে-উড়তে শত্রুকে ঘায়েল করছে!

আমি পড়ে আছি। আমার ওপর ঘোড়া আঘাত করেই চলেছে। আমি যতবারই মাথা তুলে ওঠবার চেষ্টা করছি, ততবারই সেই মৃত-মানুষরা চিৎকার করে তাড়া দিচ্ছে। আর তাদের চিৎকার শুনে ঘোড়াও দ্বিগুণ জোরে আমাকে আঘাত করছে। ঘোড়াটার এই নৃশংস আচরণে আমি থ হয়ে গেলুম! মনে মনে ভাবলুম, তবে কি ওরা আমার ঘোড়াটারও প্রাণ নিয়েছে! সেই মৃত ঘোড়ার প্রেতাত্মা বুঝি আমারও প্রাণ নেবার জন্যে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে! আমি বুঝতে পারলুম না।

শুধু বুঝলুম, ভীষণ আঘাতে আমার কোমর, আমার হাত-পায়ের আর কোনো সাড় নেই। বুকের ভেতরের দমটা যেন আটকে আসছে। তারই যন্ত্রণায় আমি ছটফট করছি। আমার মাথা কেটে রক্ত ঝরছে। কিছুতেই সে-রক্ত থামছে না! আমিও বোধ হয় এক্ষুনি ওই মৃত-মানুষের মিছিলে সামিল হব। আমি জ্ঞান হারালুম। সুতরাং আর কিছু জানি না।

চার

আমি পড়ে ছিলুম মুখ থুবড়ে একটা খোলা মাঠে। যখন ভোরের আলো উপচে ছড়িয়ে পড়েছে, তখনই হয়তো আমি আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলুম। আমার বুজে যাওয়া চোখ দুটি আলোর দিকে চাইতে পারেনি প্রথমটা। ভারী কষ্ট হচ্ছিল। আলোর রশ্মি চোখে পড়তেই জ্বলে উঠছিল চোখের তারা দুটি। আমি পারছিলুম না আকাশের

দিকে চোখ মেলতে। শুধু মাটির ওপর হাত পেতে আমি সূর্য দেবতা 'রে'-র স্পর্শ নিচ্ছিলুম, আর মনে-মনে তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলুম, "আমি কি এখনও বেঁচে আছি?"

হ্যাঁ, বিশ্বাস করতে পারছি, আমি বেঁচে আছি, কেননা, অনেক চেষ্টা করে আমি উঠে বসলুম। উঃ! কী অসহ্য যন্ত্রণা! সারা শরীরে ক্ষত। রক্তের বিন্দুগুলি এখনও শুকিয়ে যায়নি। কোথাও-কোথাও চাপ-চাপ দানা বেঁধে গেছে। চোখ সরিয়ে দূরে চাইতেই আমি দেখলুম, পামগাছগুলি তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। সকালের বাতাস লেগেছে গাছের পাতায়। আমি দেখতে পেলুম, এই প্রান্তরের চারিপাশে আগুন-ঝলসানো বাড়িগুলো ধ্বংসস্তূপের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, অথবা মাটির ওপর ভেঙে লুটিয়ে পড়েছে! আমার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল হঠাৎ। ওই তো সামনেই আমার ঘোড়াটা মরে পড়ে আছে। তাকে দেখে আমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলুম, পারলুম না। এই সময় কেউ যদি আমাকে একটু সাহায্য করত! কাছে-পিঠে কেউ নেই! চারিদিক নির্জন। যারা বেঁচে ছিল এতদিন, তারাও এই জায়গা ছেড়ে চলে গেছে! এ যেন এক মৃত্যুপুরী! মৃত্যুর গন্ধ ছাড়া আমার নাকে আর কিছুই ঢুকছে না। এখন আশ্চর্য হয়ে ভাবতে পারি, আমি কার দয়ায় বাঁচলুম! কে আমায় ওই মৃত মানুষগুলোর হাত থেকে বাঁচাল! না কি, তারা মনে করেছে আমার মৃত্যু হয়েছে, তাই আমাকে নিস্তার দিল!

হঠাৎ কেমন খটকা লাগল আমার শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে। আমি দেখি কি, আমার মাথার ঠিক ওপরে একটি পাখি ঘুরে-ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে। ঘুরপাক খাচ্ছে! আমি সন্দেহে চোখ ফেরাতে না-ফেরাতেই আমার ঠিক মনে হল, আরে, এই পাখিটাই তো সেই পাখি! আমার অভিষেকের দিনে এই পাখিটাই তো আমি আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। এই পাখিটাই তো ফেরেনি আমার প্রাসাদে! হ্যাঁ, ঠিক তাই। ওই তো স্পষ্ট দেখছি আমি রঙিন ওই পাখির ডানা দুটি

গাঢ় নীল রঙে আঁকা। আমি দেখছি তার গলায় সেই সোনার চেনে বাঁধা আমার নিশান। কে ভেবেছিল, হঠাৎ এই অবস্থায় পাখিটাকে আমি দেখতে পাব! কোথা থেকে এল পাখি! কেন এল! কেনই বা আমার মাথার ওপর সে উড়ে-উড়ে ঘুরে বেড়ায়। এ-খবর এখন আমায় কে বলবে? তবে কি পাখিটা আমায় চিনতে পেরেছে? চিনতে পেরেছে, পৃথিবীর দুর্ধর্ষ এক সম্রাট পরাজয়ে বিধ্বস্ত হয়ে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে?

না, বিধ্বস্ত হতে জানি না আমি। ওই পাখিটাকে দেখে আমি যেন শরীরে আবার বল ফিরে পাচ্ছি! হ্যাঁ, আমি পারলুম দাঁড়াতে! আমি হাত বাড়ালুম আমার মাথার ঠিক ওপরে পাখিটাকে ডাকতে-ডাকতে। সে এল না। আকাশ থেকে নামল না। উড়ে-উড়ে এগিয়ে যায়! দেখতে-দেখতে আমিও এগিয়ে চলি।

ভারী আশ্চর্য লাগল আমার! পাখিটা না-হয় আমার কাছে না-ই এল, কিন্তু আমার চোখের বাইরে উড়ে পালাচ্ছে না তো! তবে কি ও কিছু মতলব ঠাউরেছে? না আমাকে কিছু বলতে চায়? অথবা এমনি করে আর এক রহস্যের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়? হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, দেবতা 'থথ' আমায় বলেছিলেন, আমার এই ছোট্ট পাখি সেই ছোট্ট মেয়ে জুয়ামের গান শুনে ভুলে বসেছে প্রাসাদে ফেরার কথা। সে-পাখি জুয়ামের গান শুনতে-শুনতে তারই কাছে, তারই পাশে নিজেও গান গাইছে এখনও। কিন্তু তাই যদি হবে, তবে পাখি আছে জুয়াম কই? তাকে যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমার প্রাসাদে! তাকে বাঁচাতে হবে এই মৃত-আত্মাদের কবল থেকে। 'থথ' বলেছেন, আমার জন্যে সে গান ভুলেছে। আমাকেই তার গলায় আবার গান ফিরিয়ে দিতে হবে। নইলে আমার ধ্বংস!

আচমকা পাখিটা আকাশে উড়তে-উড়তে হারিয়ে গেল কোথায়? আমি তো তাকে আর দেখতে পাচ্ছি না! নিমেষে আমার চোখকে

ফাঁকি দিয়ে সে কোথায় লুকাল! আমি হতভম্ব! দাঁড়িয়ে রইলুম, ঠায় আকাশের দিকে চেয়ে!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও পাখিটাকে আর দেখা গেল না। সুতরাং শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমারও আর অপেক্ষা করার কারণ আমি খুঁজে পাই না। আমি হতাশ মনে আকাশ থেকে চোখ নামালাম। নামিয়ে আমি থমকে গেছি। দেখি কী, একটি গাছের ছায়ায় পড়ে আছে একটি মেয়ে! সে ছোট্ট। মেঘে-ঢাকা আকাশ হঠাৎ রোদের ছোঁয়ায় ঝিকমিকিয়ে উঠলে যেমন খুশিতে ভরে যায়, তাকে দেখে তেমনি আমিও খুশিতে উছলে উঠলাম। আমি জানি না সে জুয়াম কিনা। তবু দেখছি তাকে একদৃষ্টে, অবাক চোখে। ভারী ক্লান্ত মুখখানি। চোখ দুটি ফোলা-ফোলা। ছলছল করছে। হয়তো কেঁদেছে ক'দিন। হয়তো কেঁদেছে মার জন্যে, বাবার জন্যে। হয়তো কাঁদতে-কাঁদতে কান্না তার ফুরিয়ে গেছে! সে-কান্না যেন এখনও তার ঠোঁট দুটিতে জড়িয়ে-জড়িয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে! সে আমাকে দেখছে হয়তো অনেকক্ষণ ধরে। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে আনত হল। উঠে দাঁড়াল। পিছু ফিরল। হাঁটা দিল ক্লান্ত পায়ে। সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঠোঁট দুটি কেন জানি আপনা-আপনি অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, "জুয়াম!"

সে চকিতে ফিরে তাকাল আমার দিকে। ভীরু হরিণীর মতো চোখ দুটি তার কুঁকড়ে গেল! সে ছুট দিল।

আমি ছুটতে পারলুম না। কেননা, আমার সেই মুহূর্তে আর ছোটার মতো অবস্থা নয়। তাই আবার ডাক দিলুম, "জুয়াম।"

ওই একটু দূরেই নীলনদের কল্লোল শোনা যাচ্ছে। আমার ডাক বোধহয় ওই কল্লোলে হারিয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়েই রইলুম আর মনে-মনে ভাবলুম, তবে সত্যিই কি জুয়ামের দেখা পেয়েছি!

আমি এবার আবার হাঁটলুম ও যে-পথে ছুটে গেল, সেই পথে। হাঁটতে-হাঁটতে দেখছি আগুনে পোড়া সেই কালো চিহ্নগুলি।

চারিদিকে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে ভয়ংকর চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে! যতই দেখছি, নিজেকে ধিক্কার দিতে-দিতে জ্বলে উঠছে আমার মন! সত্যিই, আমি কি পিশাচ?

অবাক হয়ে গেলুম দেখে, এই ধ্বংসের মধ্যেও একটি দেবতার মন্দির তখনও দাঁড়িয়ে আছে অটুট চেহারায়। আমি মন্দিরের দিকেই এগিয়ে গেলুম। মন্দিরের তোরণ পেরুতেই আমার নজরে পড়ল, দেবতাদের রাজা অ্যামন-এর নিখুঁত মূর্তিটি। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সোনার বেদীতে। তাঁর মুখখানি মেষের মতো। মাথার দুপাশে দুটি মেষশৃঙ্গ। আমি তাঁর পায়ের কাছে নত হলুম। আমার এ-পাপকাজের জন্য তাঁর কাছে বারে-বারে ক্ষমা চেয়েও আমি তৃপ্তি পেলুম না। আমার চোখ দুটি তাঁকে দেখতে-দেখতে ছলছলিয়ে গেল।

আমি চোখের পাতা দুটি মোছার জন্য হাত বাড়াতেই আমার চমক ভাঙল। হঠাৎ আমার নজর পড়ল, মন্দিরের এককোণে কে যেন চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই ছোট্ট মেয়েটি। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে দেখছে আমাকে। ভারী অবাক সে চাউনি। আমি একটি-একটি পা ফেলে তারই দিকে এগিয়ে গেলুম। তার কাছে, আরও কাছে। এবার সে কিন্তু ছুটে পালাল না। দাঁড়িয়ে রইল কাঠের মতো। আমি তার দিকে হাত বাড়ালুম। শান্ত গলায় ডাকলুম "জুয়াম!" সঙ্গে-সঙ্গে দেখতে পেলুম তার চোখ দিয়ে অশ্রুর ফোঁটাগুলি দুটি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। আমি কথা বলতে পারলুম না।

আমায় দেখতে-দেখতে সে যখন আর কাঁদতে পারল না, তখন সে চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে, দেওয়ালের কোণে মাথা রেখে ডুকরে উঠল। আমার মনটা ব্যথিয়ে উঠল। এগিয়ে গেলুম তার আরও একটু কাছে। তার মাথায় হাত রাখলুম। এবার যেন অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামল তার কান্নায়। আমি তাকে টেনে নিলুম আমার বুকের কাছে। আমার আদর-ভরা হাতখানি দিয়ে তার চোখ দুটি মুছিয়ে দিলুম। কিন্তু তবু তার চোখের কান্না বাঁধ মানছে না। তার চিবুকটি হাতে



ছুঁয়ে খুব আলতো স্বরে জিজ্ঞেস করলুম, “জুয়াম, তুমি আমার সঙ্গে যাবে, আমার বাড়িতে ?”

জুয়াম উত্তর দিল না।

আমি বললুম, “জুয়াম, আমি সম্রাট।”

মেয়েটি চকিতে রোষ-ভরা চোখে চাইল আমার দিকে। তার চোখের কান্না থমকে গেল আমার দিকে তাকিয়ে, আমার কথা শুনে।

আমি আবার বললুম, “হ্যাঁ জুয়াম, আমি সম্রাট। আমিই সেই নির্দয় মানুষ। আমিই তোমাদের দেশে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি। আমার সেই অত্যাচারের আগুনেই তোমার মা-বাবা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। তোমাদের ঘর-বাড়ি সব ধ্বংস হয়ে গেছে। ওই যে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ভগ্নস্তূপ, এ যে এই আমার হাতের খুনের চিহ্ন! আমি অজ্ঞাতে, ক্রোধের বশে যা করে ফেলেছি, জানি তার ক্ষমা নেই। জুয়াম, তুমি এখন কত ছোট। কিন্তু আমি তো তোমার মা-বাবাকে আর ফিরিয়ে দিতে পারব না তোমাকে। পারব না আমি তাদের মতো তোমার আপন হতে। তবু পারব আমার সব সাধ্য দিয়ে, আমার সব স্নেহ ঢেলে তোমাকে আপন করে নিতে। তাই আমি তোমার কাছে এসেছি জুয়াম। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে আমার এ-পাপকাজ থেকে আমি খানিকটাও মুক্ত হব। তুমি চলো আমার সঙ্গে।”

“না-আ-আ।” চিৎকার করে উঠল জুয়াম। কী ভীষণ তার চোখের দৃষ্টি।

“জুয়াম, তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমারও এখান থেকে যাওয়া হবে না। এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই আমাকে থাকতে হবে। কিংবা মরতে হবে।”

সে আবার চিৎকার করে উঠল, “আমি যাব না, কিছুতেই যাব না।” বলে ছিটকে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। ঘৃণায় মুখখানা তার লাল হয়ে গেছে।

আমি তার কাছে এগিয়ে যাবার জন্যে আবার পা ফেলেছি। কিন্তু না, আমায় যেতে হল না। সে-ই ছুটে এল আমার কাছে। ছোট্ট তার দু'হাতের মুঠি শক্ত করে আমার বুকের ওপর আঘাত করতে-করতে ককিয়ে উঠল, "কেন, কেন তুমি আমার মাকে মারলে? কেন আমার বাবাকে মারলে? তুমি ঘাতক! ঘাতক! ঘাতক! আমি যাব না তোমার সঙ্গে, কিছুতেই যাব না।" বলতে-বলতে সে আবার ছুটে আমার নাগালের বাইরে চলে গেল। চলে গেল দেবতা অ্যামন-এর এই মন্দিরের ভেতর থেকে, দূরে ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। ক'দিন ধরে এই স্তূপের মধ্যেই কেঁদে-কেঁদে সারা হয়ে সে খুঁজেছে ওর মাকে আর বাবাকে। আজও সে খুঁজবে। আজও সে কাঁদবে।

আমি আর হাঁটতে পারলুম না। আর শক্তি নেই। আমি বড় ক্লান্ত, আমি আহত। আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম। এইখানে, এই মন্দিরের ছায়ায়। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছি, হ্যাঁ, জুয়াম ঠিকই বলেছে, আমি ঘাতক! কিন্তু এর পর আমি কী করব! ছোট্ট মেয়ে জুয়ামকে যদি-বা খুঁজে পেলুম, তার মন তো ভোলাতে পারলুম না!

আমি আর দাঁড়াতে পারছিলুম না। অবসন্ন দেহটা আমার থরথর করে কাঁপছিল। মাথাটা এত ভার-ভার লাগছে! চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। আমি যদি পড়ে যাই! এ-কথাটা মনে হতেই আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম সেইখানেই বসে পড়লুম। সেই মেঝেতে। তারপর গা এলিয়ে শুয়ে পড়লুম।

জানি না কতক্ষণ এমনি করে শুয়ে ছিলুম আমি মন্দিরের মেঝেতে। আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কে যেন হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে দিল। কার যেন হাতের স্পর্শ আমার বুকের ওপর! ভারী নরম! কে যেন ধীরে-ধীরে আমার আহত গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে! আমি চেয়ে ফেলেছি! চেয়ে অবাক হয়ে গেছি! দেখি, সেই ছোট্ট মেয়েটি যে! হাঁটু গেড়ে আমার পাশেই বসে! আমার বুকের ওপর তার হাত দুটি আলতো ছোঁয়ায় ঢেউ খেলছে! আদর করে সে আমার বুকে হাত



বুলোচ্ছে! আমার চোখ এ যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। আমি পলক পড়ার আগেই উঠে বসেছি। তার চিবুকটি হাতে নিয়ে, নির্বাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম একটুক্ষণ। তারপর ডাক দিলুম, "জুয়াম, তুমি!"

অভিমানে ঝলসে উঠে একটি ছোট্ট পাখির মতো সে আমার বুকের ওপর ছটফটিয়ে হারিয়ে গেল। তারপর কেঁদে ফেলল। আমি জড়িয়ে ধরলুম তাকে। উঠে দাঁড়ালুম। দেবতা অ্যামনের সামনে দাঁড়িয়ে সেই ছোট্ট মেয়েটির চোখের জল মুছতে-মুছতে বললুম, "কেঁদো না জুয়াম। ওই দেবতা জানেন, আমি তোমার বন্ধু। এই পৃথিবীতে আমি যতদিন আছি, তুমি জেনো, তোমার দুঃখের সব বোঝা আমার। দেবতার সামনে সম্রাটের প্রতিজ্ঞা মিথ্যে হবে না। কোনোদিনও না। তুমি চলো আমার সঙ্গে!"

জুয়াম আমার বুকখানা দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল। অগাধ সমুদ্রে ডুবতে-ডুবতে হঠাৎ যেন পায়ের নীচে শক্ত মাটি ঠেকেছে তার। সে বুঝি আশ্রয় ফিরে পেল! আমি তাকে বুকে নিয়ে প্রাসাদে চললুম। তখন রোদ-ঝলমল আকাশে আলো-ঝিলমিল দিন। ভারী উজ্জ্বল।

আমার মনের ভেতরে যে কী ভাল লাগছে, কী বলি তোমায়! একটু আগে যে আমি ক্লান্ত, অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছিলুম, জুয়ামকে বুকে পেয়ে সে-ক্লান্তি আমার কোথায় পালিয়েছে! আমার পা দুটো যেন বাগ মানছে না! কী দ্রুত হাঁটছি! বলতে পারো হাঁটছি না তো, যেন ছুটছি। ওই নীলনদের ঢেউয়ের মতো আমি তখন চঞ্চল অথবা দুরন্ত!

আমি যা ভেবেছিলুম, তার অনেক আগেই আমি আমার রাজধানীতে পৌঁছে গেছি। আমার সব স্বপ্নের রঙ দিয়ে আমি গড়েছি আমার রাজধানী। যেতে-যেতে ভারী আশ্চর্য-চোখে দেখছে জুয়াম পাতি-পাতি করে। বড়-বড় রাজপথ। দু-ধারে গাছ-গাছালির সবুজ ছায়া। গাছে-গাছে ফুলের বাহার। তার ফাঁকে-ফাঁকে

তাক-লাগানো কত সব সুন্দর-সুন্দর মূর্তি সাজানো। সে-সব মূর্তির কোনোটা মানুষের দেহে সারস-পাখির মাথা! কিম্বা শেয়ালের পিঠে পাখির ডানা। একটা জলহস্তী, তো একটা কেউটে সাপ, কী ভয়ংকর তার ফণা! আমার রাজধানীর পথে-পথে কত তোরণ! তার নিচু দিয়ে যেতে-যেতে থ হয়ে চেয়ে থাকে জুয়াম! মুখে কথা নেই। নিশ্বাস পড়ছে ঘন-ঘন।

জুয়াম দেখছে, কত মানুষ রাজধানীর পথে-পথে চলছে-ফিরছে। কত রকম পসরা হাটে-হাটে বিকিকিনি হচ্ছে। কত ঘোড়া, কত হাতি, বাদামি ভালুক, রঙিন পাখি। সোনার সাজ। মণিমুক্তা। কত রকম বাজনা-বাদ্যি। জরির কাজ-করা পোশাক-পরিচ্ছদ। বড়-বড় রথ। কত সব অস্ত্রশস্ত্র! দেখতে-দেখতে চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে জুয়ামের।

আমি হঠাৎই জিজ্ঞেস করেছিলুম, "জুয়াম, ভালুক নেবে?"

জুয়াম কোনো উত্তর না-দিয়ে চেয়ে দেখছিল সামনেটা। চেয়ে ছিল তুষারের মতো ঝলমলে দেবতার মন্দিরগুলির দিকে। ওর যেন মন ভরে যায় সেই মন্দিরগুলি দেখতে-দেখতে। আমার রাজধানীর পথে-পথে এমন যে কত মন্দির শোভা পাচ্ছে, তুমি গুনে শেষ করতে পারবে না। কী চমৎকার সাজানো-গোছানো সেই সব মন্দির। পরিষ্কার ঝকঝকে, তকতকে। চারিদিকে সবুজ পামগাছের বাহার, মন্দিরের সোনার চূড়ায় সূর্য-আলোর চকমকি!

আমাদের যে কত দেব-দেবী, বলে শেষ করতে পারব না! দেবতাদের রাজা হলেন 'অ্যামন-রে'। জলহস্তীর মতো দেখতে যাঁকে, তার নাম 'টরেটের'। বামন-দেবতা 'বেশ'-কে কী হাসিখুশি দেখতে! আছেন 'ওসাইরিস'। আছেন 'থথ'।

জুয়াম সেই সব মন্দিরই দেখছে অপলক দৃষ্টিতে। আমি তার মুখের দিকে চাইলুম ক্ষণেক। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলুম, "জুয়াম, তোমার ভাল লাগছে?"

এবারও সে আমার কথার উত্তর দিল না। দেখতেই লাগল।

পাঁচ

আমি ফিরে এলুম প্রাসাদে। প্রাসাদের সমস্ত মানুষ অবাক হয়ে গেল আমাকে দেখে। অবাক হল আমার কোলে ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে।

আমি প্রাসাদে পৌঁছেই হুকুম করলাম, আমার পাশের ঘরটি হবে এই ছোট্ট মেয়ে জুয়ামের ঘর। আমার আদেশ হল, এ-ঘরটিকে রূপকথার স্বপ্নরাজ্য বানাও।

অমনি সেই ঘরে সাজানো হল কত-সব বহুমূল্য আসবাব। তাতে সোনার কাজ করা। দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী দিয়ে খোদাই করানো হল কত-না মন-ভরানো পুতুল, কত মূর্তি। চারিদিকে খেলনা। বাক্সভর্তি পোশাক। সারা ঘরে শুধু আলোর রঙ আর খুশির ছবি।

আমি ডেকে পাঠালুম প্রাসাদের সেই বৃদ্ধা দাসীকে। তাকে বললুম, "এই ছোট্ট মেয়েটিকে দেখাশোনার ভার আজ থেকে তোমার ওপর দেওয়া হল। ওর দুঃখকে ভোলাতে হবে তোমায়। ওর মুছে-যাওয়া হাসিটুকু ফিরিয়ে আনতে হবে তোমায়। ওকে খুশিতে ভরিয়ে রাখতে হবে তোমায়।"

জুয়ামের জন্য সুন্দর একটি বাগান তৈরি হল। সুন্দর বাগানে রঙিন ফুলের গাছ বসানো হল। রঙিন পাখির ঝাঁক আনা হল। ফুলের বাগানে তারা গান গাইবে।

জুয়াম শুধু দেখছে আর দেখছে। দেখতে-দেখতে কেমন যেন আনমনা হয়ে যাচ্ছে! তবু সে হাসে না। তবু কথা বলে না। শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখে। চেয়ে থাকে মাঝে-মাঝে ওই আকাশের দিকে, কিংবা আমার মুখের দিকে।

একদিন তাকে ডাকলুম আমার কাছে। তার মুখখানি টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "জুয়াম, তুমি কথা বল না কেন আমার সঙ্গে?"

জুয়াম মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "এখনও বুঝি রাগ করে আছ?"

সে শুধু ঘাড় নাড়ল।

"তবে?"

সে স্থির হয়ে আমার চোখের দিকে তাকাল।

আমি বললুম, "তুমি আর কী চাও, জুয়াম?"

আমার চোখে চোখ রেখে তার চোখ দুটি জলে ভরে গেল। আমি শিউরে উঠলুম। কেননা, আমার যেন মনে হল, ওই চোখ দুটি কাঁদতে-কাঁদতে বলছে, "তুমি আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, আমার বাবাকে ফিরিয়ে আনো।"

আমি জুয়ামের হাত দুটি চেপে ধরলুম। ঠিক তক্ষুণি বাগানে গাছের পাতায় হাওয়ার ঝুমঝুমি বেজে উঠল।

জুয়াম নিজেই চোখের জল মুছে ফেললে।

আমি বললুম, "জুয়াম, বাগানে যাবে?"

জুয়াম আমার হাত ধরে হাঁটল।

আমরা বাগানে ঢুকতেই এমন দমকা হাওয়া বয়ে গেল এক ঝলক! দেখলুম, যে-গাছটায় কুঁড়ি ধরেছে, এই বুঝি সেই গাছ হাওয়ার ঝাপটায় ছিটকে পড়ে! জুয়াম ছুটে যায়! গাছের যে-ডালে কুঁড়ি ধরেছে, সেই ডালটি দু-হাত দিয়ে বুকের কাছে আগলে নিয়ে বসে পড়ে!

আমি হেসে ফেলি।

আমার হাসি শুনে জুয়াম দাঁড়িয়ে পড়ল লজ্জায়।

আমি বললুম, "জুয়াম, ছাখো, কত পাখি!"

পাখিরা ডাকছে, ডানা মেলে উড়ছে, জুয়াম দেখছে।

আমি বললুম, "পাখিরা গান গাইছে।"

ওদের দিকে কেমন উদাস চোখে চেয়ে রইল জুয়াম।

আমি ঠিক এই সময়েই বলে ফেললুম, "তুমিও তো গাইতে পারো জুয়াম। একটা গান শোনাও-না!"

জুয়াম ছুট দিল অতর্কিতে। ছুট দিল বাগান থেকে বাইরে। আমি প্রথমটা হকচকিয়ে গেছি। তারপর ডাক দিয়েছি, "জুয়াম!"

আমার ডাক শুনে পাখিগুলো এ-ডাল থেকে ও-ডালে উড়ে পালাল।

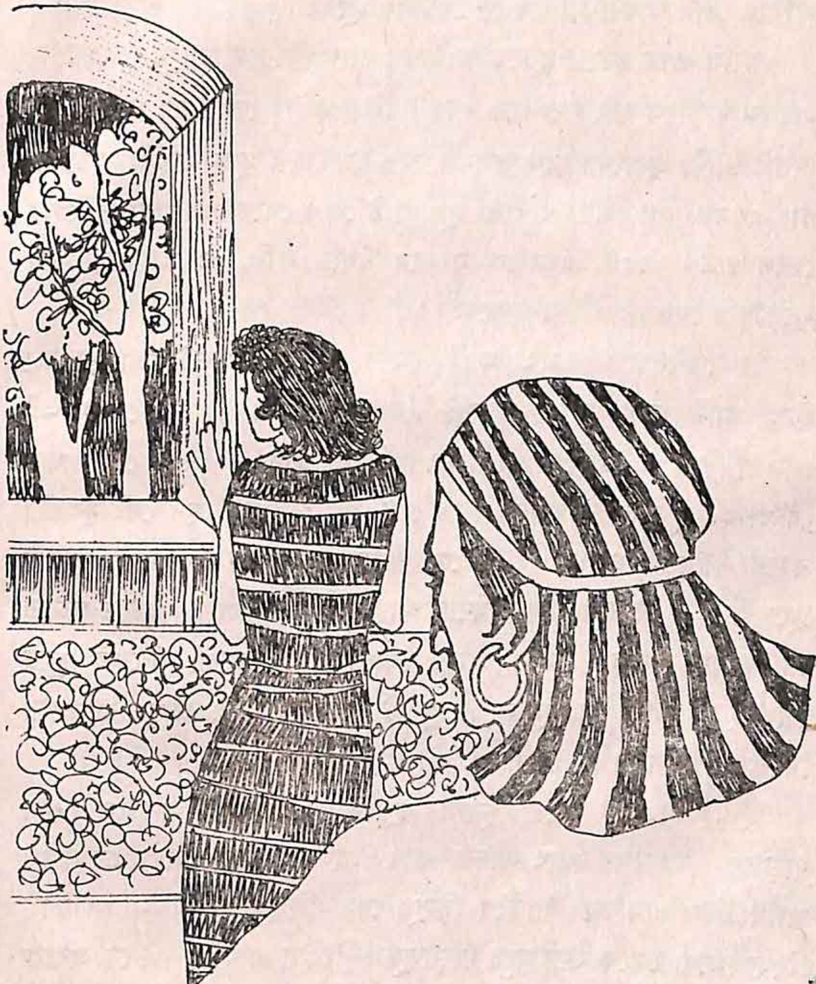
আমি ডাকতে-ডাকতে ফিরে এলুম। জুয়ামকে খুঁজতে-খুঁজতে দেখি, সে নিজের ঘরে ফিরে এসেছে। তার ছোট্ট ঘরেরছোট্ট ঝরোকায় মুখ বাড়িয়ে চেয়ে আছে বাইরে, ওই দূরে। যেখানে অনেক মানুষ, অনেক কথা, অনেক মুখ। আমি চুপি-চুপি ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। ওর মাথায় হাত রাখলুম। তারপর বললুম, "জুয়াম, একদিন আমরা রথে চড়ে, দূরে ওই পথ ধরে বেড়াতে যাব।"

জুয়ামের চোখের পাতা-দুটি ঝলমলিয়ে উঠল। তারপর ওই দূরের দিকেই সে চেয়ে রইল।

ছয়

আমি জানতুম না, আজ সকালে ঘুম ভাঙলে আমি জুয়ামকে দেখতে পাব আমারই ঘরে। পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে আছে জানলায়। এই সকালে আমার ঘরে তাকে দেখে আমার অবাক হবারই কথা। জানি না, কেন দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। আমার ঘরের এই জানলায় চোখ রাখলে স্পষ্ট দেখা যায় জুয়ামের ছোট্ট বাগানটা। আমি ভাবলুম, বুঝি-বা জুয়াম বাগানের রঙিন পাখিগুলির দিকে তাকিয়ে আছে। হয়তো তাদের ডানায় ছড়ানো রঙের বাহার দেখছে। কিংবা গান শুনছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, তার সারা গায়ে সকালের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ভারী ভাল লাগছে তাকে। আমি দেখতে-দেখতেই চুপিসারে ডাক দিলুম, "জুয়াম!"

বিদ্যুতের মতো চমকে উঠেছে সে। আমাকে দেখেই সে ছুট দিল। তাকে ছুটতে দেখে আমি হতভম্ব। ডাকব কি ডাকব না



ভাবতে-ভাবতেই সে যে কোথায় উধাও হয়ে গেল আমি হদিসই করতে পারলুম না। আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছি। ঘরের দরজা পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু কোথায় জুয়াম! আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে কোথায় লুকোল!

আমি প্রায় ছুটতে-ছুটতে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। হয়তো এখানে দাঁড়ালে তাকে দেখতে পাব। কিন্তু কই? দেখা তো যাচ্ছে না। আমি জানি, জুয়ামের দুঃখ এখনও তার মন থেকে মুছে যায়নি হয়তো-বা এখনও মা আর বাবার মুখ দুটি থেকে-থেকে ওর চোখের ওপর ভেসে ওঠে। তাই, এখন কেমন করে বিশ্বাস করি, ও আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে, এই সকালবেলা।

দেখতে-দেখতে হঠাৎ আমি চমকে উঠেছি। ওই তো জুয়াম! হ্যাঁ, আমি তো জুয়ামকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে, এই জানলা দিয়ে। ওই তো বাগানের ভেতর জুয়াম! ওই তো কাল যে-গাছের কুঁড়িটি ফুল হয়নি, আজ সেটি ফুল হয়ে ফুটেছে। সেই ফুলটির কাছে দাঁড়িয়ে জুয়াম। দেখতে পাচ্ছি, জুয়াম হাত বাড়াল। ফুলটি তুলে নিল। তারপর পিছু ফিরে আবার ছুট দিল। ছুটতে-ছুটতে সে কোথায় যাচ্ছে? মনে হচ্ছে, যেন আমার ঘরের দিকেই ছুটে আসছে! আমি সরলুম না। চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলুম জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে। দেখি-না, কী করে জুয়াম!

হ্যাঁ, আমারই ঘরে ঢুকল জুয়াম। আমারই পেছনে এসে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ আদর করে আমার পিঠে মাথা ঠেকাল। আমি এমন ভান করে দাঁড়িয়ে ছিলুম যেন কিছুই জানি না। তাই মিথ্যে-মিথ্যে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালুম। কিন্তু এ কী! এ যে অবাক কাণ্ড! তার দুটি ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে পড়েছে! তার ছোট্ট দুটি আঙুলের ফাঁকে সেই ফুলটি সে ধরে আছে! কী আনন্দে যে ভরে গেল আমার মন! আমি আপন মনেই বলে ফেললুম, "আঃ! কী মিষ্টি!"

জুয়াম ফুলটি আমাকে দেবার জন্য হাত বাড়াল। আমি ধরে নিলুম। জুয়াম হাসিমাখা মুখে প্রথম কথা বলল, "কী সুন্দর!"

আমি হেসে উঠলুম। জুয়াম লজ্জায় যেন মরে গেল। আমি জুয়ামকে কাছে টেনে আমার হাতের ফুলটি তার মাথার চুলে সাজিয়ে দিয়ে বললুম, "জুয়াম আরও সুন্দর।"

এবার তার ঠোঁটের হাসি সারা মুখখানিতে ছড়িয়ে পড়ল। আমি তার হাসি দেখে আমার মনের খুশিকে বেঁধে রাখতে পারলুম না। আমি তাই বলেই ফেললুম, "জুয়াম, এবার আমায় একটি গান শোনাও।"

এ-কথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই জুয়ামের মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। আমার দিকে না-চেয়ে ধীরে-ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গাইল না সে।

আমি দেবতা 'থথ'-এর একটি আদেশ পূর্ণ করেছি। জুয়ামকে আমি ছিনিয়ে আনতে পেরেছি ওই মৃত-মানুষগুলোর হাত থেকে। আমি তাকে বাঁচাতে পেরেছি। আমি জানি, ধীরে-ধীরে এই প্রাসাদকে জুয়াম ভালবেসে ফেলছে। আমি জানি, একদিন ধীরে-ধীরে জুয়াম খুঁজে পাবে তার আপনজনকে আমারই মধ্যে। আমারই মধ্যে সেদিন সে হয়তো খুঁজে পাবে তার হারানো মা আর বাবাকে! কিন্তু জানি না, কেমন করে খুঁজে পাব তার গলার সুরকে। কেমন করে শুনতে পাব তার গান! জানি না, কবে জুয়ামের গান শুনতে-শুনতে আমি দেবতা 'থথ'-এর মন্দিরে ছুটে গিয়ে তাঁকে বলতে পারব, "হে দেবতা, আমি তোমার সব অদেশই পালন করেছি। এবার আমার একটি ইচ্ছা পূর্ণ করে দাও! তোমার ওই শ্রেষ্ঠ সন্তানকে যেন আমারই সন্তান বলে আমি ভাবতে পারি।"

আমি জানি না, আমার মনের এই কথা শুনে দেবতা 'থথ' মনে-মনে হেসেছিলেন কিনা! কেননা, আমি জানতুম না, এক ভয়ংকর বিপদ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। বিপদ তো আর

কাউকে জানান দিয়ে আসে না। সুতরাং সেই বিপদের কথা আমার জানার কথাও নয়। তখন আমার একটিই প্রতিজ্ঞা, জুয়ামের কণ্ঠে যেমন করে হোক গান ফিরিয়ে আনতে হবে। এই কথা ভেবেই আমি একদিন জুয়ামকে বললুম, "জুয়াম, বেড়াতে যাবে?"

সে জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

আমি বললুম, "অ-নে-ক, অ-নে-ক দূরে।"

সে বলল, "পায়ে-পায়ে?"

আমি হাসলুম। বললুম, "না না, রথে চড়ে।"

সে তার ছোট্ট মাথাটি দুলিয়ে বলল, "যাব।"

আমার রথ ছুটল। আমার পাশে বসে আমার সঙ্গে জুয়াম ছুটল। ওর রেশমি পোশাকগুলি হাওয়ায় উড়ে-উড়ে ঢেউ তুলছে। মাথার চুলগুলি উড়তে-উড়তে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই চুলগুলি সরিয়ে-সরিয়ে অবাক চোখে দেখছে জুয়াম। দেখছে, দূরে ওই নীলনদ। আরও দূরে জলের বুকে সারে-সারে নৌকো। ওপরে খোলা আকাশ। হঠাৎ যেন শুনতে পায় জুয়াম, কারা বুঝি গান গায়! মুখখানি যেন বিষাদে ছেয়ে গেল জুয়ামের সেই গান শুনে!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "জুয়াম, ভাল লাগছে?"

সে ঘাড় নাড়ল।

আমি বললুম, "চলো, নৌকায় চড়ব।"

সে বললে, "ভয় করে।"

আমি বললুম, "আমি তো আছি। ভয় কী।"

সে বলল, "বেশ, তাহলে চাপব।"

আমার রথ ছুটল নীলনদের তীরে। আমি জুয়ামের হাত ধরে রথের আসন থেকে নেমে, নৌকোয় বসলুম। নীলনদের জলের দোলায় দুলতে-দুলতে নৌকো ভাসল। জুয়াম হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে বলল, "কত জল!"

আমি বললুম, "জলের নীচে কত মাছ!"

সে বলল, "কই মাছ?"

আমি বললুম, "ওই তো!"

সে দেখল। দেখতে-দেখতে দু-হাত বাজিয়ে তালি দিয়ে নেচে উঠল। নাচতে-নাচতে আবার সে শুনতে পেল গান। আবার সে থমকে গেল। আবার যেন মুখখানি তার বিষাদে ভরে গেল। একমনে সে শুনছে সেই গান! আমি ভাবলুম, বুঝি-বা তার গলায় ওই গানের সুর গুনগুনিয়ে উঠছে! আমি তাই থাকতে পারলুম না। ভাবলুম, এবার বোধহয় বললে ও গেয়ে উঠবে। আমি তাই আদর করে বলে ফেললুম, "জুয়াম, তুমিও তো গাইতে পারো। একটা শোনাও-না আমায় গান?"

জুয়াম এক ঝটকায় আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলে উঠল, "আমি ফিরে যাব।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কেন?"

সে বললে, "ভাল লাগছে না।"

আমার খুবই অবাক লাগছে। কেননা, আমি যখনই গান গাইতে বলি জুয়ামের যেন কিছুই ভাল লাগে না। কেমন যেন নিষ্প্রাণ হয়ে যায় ওর এই সুন্দর মুখখানি! আমি ভাবছি, তবে কি জুয়াম আর কোনোদিনই গান গাইবে না! না কি, গানের কথা বললেই ওর মনে পড়ে যায় সেই দিনগুলির কথা, সেই দিনগুলি, যখন জুয়াম গান শোনাত মা আর বাবাকে। হয়তো-বা তাই। নয়তো গানের কথা শুনলে ওর মুখখানি শুকিয়ে যায় কেন এমন করে! ওর এই হাসিমাখা মুখখানি।

আকাশের রঙ হঠাৎ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল! ছায়ার মুখোশ পরে মেঘ ভেসে যায়। কে জানে, ঝড় উঠবে কিনা! বলা তো যায় না! আমি দেখলুম, ফিরেই যেতে হয়। কেননা, মেঘের সঙ্গে বেলাও গড়িয়ে যাচ্ছে। আমার নৌকো তীরে ভিড়ল, আমার রথ ঘরে ছুটল।

আজ আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন প্রাসাদের প্রধান পুরোহিত। প্রাসাদে পৌঁছেই জুয়াম ছুটে গেল তার নিজের ঘরে। আর আমার দরবারে ছুটে এলেন প্রধান-পুরোহিত। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, "কিছু বলবেন ?"

তিনি বললেন, "সম্রাট যদি আজ্ঞা করেন, বলতে পারি।"

আমি বললুম, "বেশ তো বলুন, কী বলতে চান ?"

তিনি বললেন, "সম্রাট, আমি আপনার কাছে একটি বিশেষ আরজি নিয়ে এসেছি।"

"আরজি ?"

"হ্যাঁ সম্রাট। আরজিটি অবশ্য আমার একার নয়। অনেকের।"

"আমি সকলেরই সম্রাট। সুতরাং সকলের কথা তো আমাকে শুনতেই হয়। কিন্তু আরজিটি কিসের ?"

"দেখুন সম্রাট, আপনার একটি বিশেষ কাজে রাজ্যের অনেক মানুষই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট !"

আমি পুরোহিতের কথা শুনে থমকে গেছি! আমি সম্রাট। আমার কাজে অসন্তুষ্ট! আমার মুখের ওপর এ-কথা বলার সাহস কোথা থেকে পেলেন পুরোহিত! আমি ভেতরে-ভেতরে ভীষণ জ্বলে গেলুম। তবু নিজেকে সামলে খানিকটা ব্যস্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলুম, "আপনি কী বলতে চান ?"

"দেখুন সম্রাট, আপনি ওই যে মেয়েটিকে প্রাসাদে নিয়ে এসেছেন, তাকে আমরা কেউ চিনি না, জানি না। তার কী পরিচয়, এটাও আমাদের অজানা। এই পরিচয়হীন মেয়েটি প্রাসাদের পবিত্রতা নষ্ট করেছে।"

আমি বিস্ফারিত চোখে পুরোহিতের দিকে তাকালুম।

পুরোহিত আবার বললেন, "এ-কাজটা কারো চোখে মোটেই ভাল ঠেকছে না। কেননা, একটি পথের মেয়ে প্রাসাদের অন্দর-মহলে স্থান পাবে, সম্রাটের করুণা লাভ করে সম্পদ ভোগ করবে, এ কখনই

চলতে পারে না। তাছাড়া সম্রাট, মেয়েটির মা-বাবা আগুনে পুড়ে মরেছে। এ যে কত বড় অমঙ্গল তা বলা যায় না। সুতরাং মেয়েটির কপালেও অলক্ষণের চিহ্ন আঁকা! তাই সে যেদিন থেকে প্রাসাদে ঢুকেছে, সেদিন থেকে পাপে ভরে গেছে এ-প্রাসাদ। আর এই পাপের ফলেই সম্রাট নিজেও রাজকার্যে তেমন করে আর মনোযোগ দিতে পারছেন না। সম্রাট, আমি নিশ্চিত জানি কদিন পরে আমাদের গোটা রাজ্যটাই পাপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এহেন অবস্থায় সকলের দাবি, মেয়েটিকে যত শীঘ্র সম্ভব প্রাসাদ থেকে আপনি নির্বাসন দিন।"

আমি পুরোহিতের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। ওঁর কথা শেষ হলে আমি বললুম, "আমি সম্রাট। দেবতার ইচ্ছায় আমি সিংহাসনে বসেছি। এই প্রাসাদ আমার। এই প্রাসাদের যা-কিছু সম্পদ সবই আমার দেবতার দান। এই রাজত্ব আমার। এই রাজত্বের ভালমন্দের ভার আমার ওপর দিয়েছেন দেবতা। এই রাজত্বের প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার আমি। কেননা, আমি মনে করি, তারা আমার সন্তান। তাই তারা আমায় শুধু সম্রাট-রূপেই নয়, দেবতারূপেও পূজা করে। তারা জানে, ওই দেবতা অ্যামন-রের আমি অংশ। সেই কারণেই আপনারা যেটা উচিত বলে মনে করেন, সেটা আমার পক্ষে কোনোক্রমেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমি আপনাদের আদেশ করছি, এই ছোট্ট মেয়েটি সম্পর্কে আর আপনারা অকারণ মাথা ঘামাবেন না। আমার নিষ্ঠুর অত্যাচারে যার এই দুর্ভাগ্য, তার জীবনে আমাকেই ফিরিয়ে আনতে হবে সুখ আর আনন্দ। তাই তাকে আমি আমার প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছি। পুরোহিতমশাই, ওই ছোট্ট মেয়েটির কপালে আপনি দেখেছেন অলক্ষণের চিহ্ন, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি সৌভাগ্যের সোনালি রেখা। মেয়েটি নিয়ে এসেছে দেবতার আশীর্বাদ। সুতরাং আপনাদের এই নির্দয় অনুরোধ আমি মেনে নিতে পারছি না। মেয়েটি প্রাসাদে

থাকবে, চিরদিন। আমারই মেয়ের মতো, আমার কাছে, এ-কথা আপনি আজই রাষ্ট্র করে দিতে পারেন।”

পুরোহিত যে আমার এ-কথায় মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না, সে আমি তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলুম। একটা চাপা উত্তেজনায় হাঁপাতে-হাঁপাতে তিনি আমার সামনে থেকে চলে গেলেন। আমিও ভীষণ মুষড়ে পড়লুম। আমি ভেবে পাচ্ছি না, প্রধান-পুরোহিতকে এ-সব কথা বলা ঠিক হল কিনা। কারণ তিনি প্রাসাদের এক সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। আমি শুধু দেবতা 'থথ'-এর আদেশমতো সব করছি।

এ-কথা তোমাদের কাছে আজ স্বীকার না-করে পারছি না, জুয়াম আমার দু-চোখের আলো। ওই মিষ্টি মুখটি যখন হাসিতে ভরে ওঠে, কিম্বা ওর খুশিতে চঞ্চল পা-দুটি যখন খেলতে-খেলতে ছুটে বেড়ায়, আমার দেখতে এত ভাল লাগে! আমি চাই ও শুধু হাসুক, এই প্রাসাদের আনাচে-কানাচে সবখানে ওর পা-দুটি খেলে-খেলে নেচে যাক। ও ভুলে থাকুক সব-কিছু। ভুলে থাকুক ওর দুঃখ, ওর ব্যথা। ও জানুক, এই প্রাসাদই ওর ঘর, ওর একেবারে নিজের। এখান থেকে ওকে যে বলবে চলে যেতে, তাকেই নিতে হবে বিদায়!

আমার ভাবতে অবাক লাগছে, এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রধান-পুরোহিতের এত মাথাব্যথা কেন! একটি ছোট্ট মেয়ের কপালে তিনি কী এমন অশুভ চিহ্ন দেখলেন যে একেবারে আমার কাছে নালিশ করতে ছুটে এলেন! না কি ভাবছেন, মেয়েটি প্রাসাদে থাকলে তাঁর স্বার্থে ঘা পড়বে। তাই বুঝি এই আতঙ্ক? অথবা অন্য কিছু? কী রহস্য এর পেছনে?

আমি ভয় পেলুম। মনে হল কিছু যেন একটা চক্রান্ত চলছে আমার চোখের আড়ালে। আচ্ছা, কেউ যদি মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে যায় প্রাসাদের অন্দর-মহল থেকে! কেউ যদি ওকে হত্যা করে! সম্রাটের ইচ্ছাই শেষ কথা। সুতরাং তখনকার মতো আমার কথাই

প্রধান-পুরোহিত মুখ বুজে মেনে নিয়েছিলেন। কারণ সম্রাটের মুখের ওপর তো কিছুই বলতে পারেন না তিনি। সম্রাটের মুখের ওপর কিছু বলা মানে তাঁর বিরোধিতা করা। আর বিরোধিতা করা মানে, দেশের শত্রুতা করা।

কিন্তু ভারী চতুর আমাদের এই প্রধান-পুরোহিতটি। গোপনে-গোপনে জুয়ামের বিরুদ্ধে তিনি প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। জনে-জনে বলে বেড়াচ্ছেন, এই ছোট্ট মেয়েটির নামে নানান অভিযোগ। এবং অভিযোগ করছেন আমার বিরুদ্ধেও। আর এমন সতর্কতার সঙ্গে এই প্রচার চলছে যে, আমি ঘুণাক্ষরেও তা জানতে পারছি না। আমি এ-ও জানতে পারিনি, এরই মধ্যে আমাদের ঘরে-ঘরে প্রধান-পুরোহিত এ-কথাটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন, ওই মেয়েটি প্রাসাদে থাকলে প্রতিটি মানুষের অমঙ্গল হবে। ওই মেয়েটা মায়াবলে সম্রাটের স্নেহ কেড়েছে। একদিন এমন আসবে, যেদিন সে সম্রাটকে হত্যা করে নিজেই সিংহাসন অধিকার করবে। মেয়েটা মানুষ না, জাদুকরী। সুতরাং সাবধান! সাবধান!

হঠাৎ একদিন জুয়াম আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, "ওরা কেন আমার সঙ্গে কথা বলে না?"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কারা বলে না?"

সে বলেছিল, "প্রাসাদের কেউ না।"

সেদিন জুয়ামের এই কথা শোনার পর আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। আমি সেইদিনই আঁচ করতে পেরেছিলুম পুরোহিতের এই জঘন্য শয়তানি ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা। আমি তাই সান্ত্বনা দিয়ে তখন জুয়ামকে বলেছিলুম, "আমি তো তোমার সঙ্গে সব সময় কথা বলি।"

কিন্তু জুয়াম আবদার করে বলেছিল, "তুমি তো বলো, কিন্তু ওরা কেন বলবে না?"

"বলবে, তোমার সঙ্গে সবাই কথা বলবে।" আমি উত্তর দিয়েছিলুম।

হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছিলুম, একটা নিশ্চিত বিপদ জুয়ামের জন্যে অপেক্ষা করছে। মনের আতঙ্ক মনের ভেতর চাপা রেখে আমি ভাবতে লাগলুম, এখন কেমন করে এই নির্দয় মানুষের হাত থেকে জুয়ামকে বাঁচানো যায়। আমার প্রথম কাজই হল, প্রধান-পুরোহিতকে আমার সামনে হাজির করা। তিনি হাজিরও হলেন। আমি তাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলুম, "যেহেতু তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করছেন, যেহেতু সম্রাটের আদেশ তিনি মানছেন না, যেহেতু সেই ছোট্ট মেয়ে জুয়ামের প্রতি তাঁর আচরণ অত্যন্ত হৃদয়হীন, সেই কারণে সম্রাট তাঁকে জানাচ্ছেন, কোনো কাজে তাঁকে আর আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। এবং তিনি অবিলম্বে প্রাসাদ ত্যাগ করবেন, এই সম্রাটের আদেশ।"

প্রধান-পুরোহিত বিদায় নিলেন। কিন্তু তিনি যে সম্রাটের এ-আদেশ মাথা পেতে নেবেন না, তা আমার জানা। এ-অপমান তিনি কেমন করে সহ্য করেন। তিনি প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেলেন বটে, কিন্তু প্রাসাদের বাইরে চলল তাঁর চক্রান্ত। তিনি সম্রাটের বিরুদ্ধে মানুষের মনে বিষ ছড়াতে লাগলেন দ্বিগুণ উৎসাহে। এবং যে-সম্রাটকে তারা এতদিন জেনে এসেছে দেবতার দূত, আজ সেই সম্রাটই ঘৃণার পাত্র। আমি অবশ্য জানতুম, এই মুহূর্তে তারা আমার বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই করতে পারবে না। সে সাহস বা শক্তি তাদের নেই। কিন্তু সুযোগ পেলে তারা যে কিছু একটা করবেই, যে-কোনো সময়ে একটা কিছু অঘটন যে ঘটে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় আমি তটস্থ হয়েছিলুম। সুতরাং আমি সেনাদলকে প্রস্তুত থাকতে হুকুম করলুম।

কিন্তু বিপদ যখন আসে, সে তো একা আসে না। তার বীভৎস মুখখানা ভয়াল রূপ ধরে চারিদিক থেকে এগিয়ে আসে! খবর হচ্ছে, সেনাদলও আমার ওপর ক্ষিপ্ত! বিষ ছড়িয়ে গেছে তাদের মধ্যেও। হয়তো বা তাদের বোঝানো হয়েছে, অলুক্ষুণে একটি মেয়েকে সম্রাট প্রাসাদে আশ্রয় দিয়ে এই রাজ্যের বিপদ ডেকে এনেছেন।

মিথ্যে-মিথ্যে বলা হয়েছে সম্রাটের এই কাজে দেবতা অ্যামন-রে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তিনি প্রধান-পুরোহিতকে স্বপ্নে আদেশ করেছেন, "মেয়েটিকে প্রাসাদ থেকে সরিয়ে ফেলো। যদি তোমরা তা না করো, তবে তোমাদের ঘরে-ঘরে মৃত্যুর ছায়া ছড়িয়ে পড়বে।"

তাদের আরও বোঝানো হল, "সম্রাট চিরদিন থাকেন না। একজন যাবেন, আর-একজন আসবেন। কিন্তু আমাদের ঘরে-ঘরে বিপদ এলে, সে-বিপদ থেকে কে আমাদের রক্ষা করবে? না না, আমরা কিছুতেই আমাদের ছেলেমেয়ে, মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি না। একফোঁটা, একটা মেয়ের জন্য আমাদের এই সর্বনাশ আমরা কিছুতেই ঘটতে দেব না! এ-সর্বনাশ আমরা রুখব। সাবধান! সাবধান! এ-মেয়ে মেয়ে নয়, একটা খুদে ডাইনি। তাকে পুড়িয়ে মারো।"

একদিন নয় দুদিন নয়, দিনের পর দিন এই কথাগুলো রাজ্যের সাধারণ মানুষের কানে-কানে উঠতে-বসতে যদি মন্ত্রের মতো জপতে থাকে কেউ, তবে তাদের মনকে তারা ঠিক রাখে কতক্ষণ! আবার এই মন্ত্র শোনাবার গুরু যদি হন প্রধান-পুরোহিত তবে তো কথাই নেই!

আমার বিরুদ্ধে এই প্রচার-অভিযান কাজে লাগল। হ্যাঁ, আমায় সবাই অবিশ্বাস, অসম্মান করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। তারা বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে, "এক খুদে ডাইনি সম্রাটের ঘাড়ে ভর করেছে। তাকে তাড়াও, তাকে মারো।"

এই অন্ধবিশ্বাস থেকে মানুষগুলোকে আমি যে কেমন করে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাব, ভেবে পাচ্ছি না। কেমন করে বোঝাব তাদের—মানুষ মানুষই। সে কখনও ডাইনি হয় না। আমাদের ব্যবহারেই আমরা কেউ পিশাচ, কেউ ডাইনি। আমাদের মনের ভালবাসাই আমাদের বড় করে। হিংসা নয়!

কিন্তু এ-কথা কে শুনছে! তবে কি দেবতা 'থথ' আমাকে

আরও কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে চান! না কি, আমি কোনো অন্যায় করে ফেলেছি অথবা পাপ করেছি যার জন্যে তিনি আমার ওপর রুষ্ট! আমি কি তবে তাঁর সামনে আবার যাব? না ওই ছোট্ট মেয়েটাকে প্রাসাদ থেকে বার করে পথের ধুলায় নামিয়ে দেব?

এত বড় স্বার্থপর, নিষ্ঠুর আমি হতে পারব না। আমার ভাগ্যে যাই আসুক, দেবতার নির্দেশ আমি অমান্য করতে পারব না। আমার শেষ প্রতিজ্ঞা, ওর কণ্ঠে আমি গান ফিরিয়ে আনব। যেমন করে পারি। আর যদি না পারি, সম্রাটের সিংহাসন ছেড়ে, মাথার মুকুট খুলে ফেলে আমি জুয়ামের হাত ধরে হারিয়ে যাব এই পৃথিবীর অজানা আর কোনো দেশে। সেখানে ওর জন্যে আমি খুঁজে বেড়াব একটু গান আর একটু আনন্দ!

হঠাৎ একদিন প্রকৃতিও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। একদিন আকাশ ছেয়ে দুর্যোগের মেঘ উঁকি মারল। ঝড় উঠল। আমি জানতুম এমন ঝড় তো কতই ওঠে, আবার শান্ত হয়। কিন্তু এ-ঝড় যে সে-ঝড় নয়, বুঝতে দেরি লাগল না। এ যে বিপদের প্রলয় সঙ্গে করে এনেছে! তাই তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। ঘূর্ণি-হাওয়ায় আকাশ ছেয়ে মরুর বালি উড়ে আসছে! মেঘ ভেঙে বাজ পড়ছে, ঘর ভাঙছে, আকাশ ভেঙে মুষলধারায় বৃষ্টি নামছে। সে-বৃষ্টি থামে না। যেন আর কোনাদিনও থামবে না। কত মানুষ মরল, কত মানুষ ভয়ে পালাল। গাছ-গাছালি উপড়ে পড়ল, আর নীলনদ গর্জে উঠল! ছাপিয়ে গেল দুই তীর। এখুনি যদি এ-প্রলয় না থামে, ভেসে যাবে নীলের জলে দেশ। চিৎকার করে উঠল মানুষ বাঁচার জন্যে। চিৎকার করতে-করতে তারা বেরিয়ে এল যে-যার ঘর থেকে। কেন না, তাদের বিশ্বাস আজ বুঝি সত্য হতে চলেছে! তারা ভাবল এ-প্রলয় নিশ্চয়ই ওই মেয়েটার জন্যে। তারই পাপে আজ সবাই মরতে বসেছে। সুতরাং শেষ আদেশটি নেবার জন্য তারা ওই ঝঞ্ঝা তুচ্ছ করে ছুটল প্রধান-পুরোহিতের কাছে। সম্রাটের চেয়ে আজ পুরোহিত তাদের

কাছে বড়। কেননা, প্রধান-পুরোহিতের কথাই আজ সত্য হয়েছে। দেশ ধ্বংস হতে চলেছে, আর তা ওই মেয়েটার জন্যে।

সেই ভয়ংকর দুর্যোগ তুচ্ছ করে, জনতার ডাক শুনতে পেয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রধান-পুরোহিত। উচ্চ কণ্ঠে গর্জন করে বললেন, "ভাই সব, আমরা কেউ মরতে চাই না, আমরা বাঁচতে চাই। কিন্তু বন্ধুগণ, আমাদের সম্রাট আমাদের বাঁচতে দেবেন না। তোমরা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ প্রকৃতি ক্ষুব্ধ। নীলনদ ক্ষিপ্ত হয়ে ভীষণ রূপ ধরেছেন। আমাদের অনেকেই আজ ওই মেয়ের পাপে জীবন হারিয়েছে। কিন্তু সময় থাকতে যদি নীলনদকে শান্ত আমরা করতে না পারি তলে তার জলোচ্ছ্বাসে আমরা সবাই মরব। আমরা অতলে তলিয়ে যাব।"

অমনি সমবেত জনতা চিৎকার করে উঠল, "আপনি বলুন নীলনদকে কেমন করে আমরা শান্ত করতে পারি!"

ওই জনতার চিৎকারের চেয়ে যেন আরও জোরে প্রধান-পুরোহিত চেঁচিয়ে উঠে বললেন, "নীলনদকে যদি শান্ত করতে চাও, তবে প্রাসাদ ভেঙে ছিনিয়ে এনে ওই মেয়েকে নীলনদের জলে ছুঁড়ে ফেলো। বন্ধুগণ, আমি তোমাদের বলছি, নীলনদ ওকে চায়। ওকে পেলেই শান্ত হবে সে। আর যদি আমরা তা না পারি, আমাদের মরতে হবে।"

জনতার চিৎকার, "না, আমরা মরব না।"

"সুতরাং বন্ধুগণ, চলো, প্রাসাদের সিংহদুয়ার ভেঙে ফেলি।"

জনতার চিৎকার, "ভাঙব, ভাঙব।"

"চলো, ছিনিয়ে আনি জুয়াম নামে সেই মেয়েকে।"

জনতার চিৎকার, "ছিনিয়ে আনব, ছিনিয়ে আনব।" বলতে বলতে সেই অসংখ্য মানুষ ঝড়ের চেয়েও আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। বজ্রগর্জনের চেয়েও আরও জোরে গর্জে উঠল। নীলনদের ঢেউয়ের চেয়েও তারা আরও উত্তাল হয়ে ছুটে চলল প্রাসাদের দিকে। মারমুখী জনতার

হাতে-হাতে মারণ-অস্ত্র। তারা আর শুনবে না কোনো কথা। তারা প্রাসাদ ভাঙবে। প্রাসাদ ভেঙে তারা জুয়ামকে ছিনিয়ে এনে নীলনদের অতল জলে ছুঁড়ে দেবে।

আমি সম্রাট। সুতরাং ভয় পাই না ওই বিদ্রোহী জনতার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে! ওরা ভাঙুক প্রাসাদ। ভাঙা প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ ডিঙিয়ে ওরা আসুক দেখি জুয়ামকে ছিনিয়ে নিতে! এই তো আমার কোলেই জুয়াম আছে! এই তো আমি জুয়ামকে নিয়েই ওদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি!

ওরা দেখল। দেখল, ওদের সামনে সম্রাট দাঁড়িয়ে। আমি ভেবেছিলুম, ওরা বুঝি আমাকে দেখে থমকে যাবে! আমি ভেবেছিলুম সম্রাটের পিছনে, সম্রাটের নামে যে যাই বলুক, সম্রাট ওদের সামনে দাঁড়ালে ওরা নিশ্চয়ই তাঁকে সম্মান জানাতে মাথা আনত করবে! না, তারা তা করল না। আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখলুম, বিদ্রোহীরা যেন রাগে ফেটে পড়ছে। তারা চিৎকার করে বলে উঠল, "ওই যে সেই মেয়ে, ওই যে সেই মেয়ে।" তারপর তারা বন্যার স্রোতের মতো উত্তাল হয়ে ধেয়ে এল আমার দিকে। আমি হাত তুলে সম্বোধন করলুম "হে আমার প্রিয় দেশবাসী", আমার কথা শেষ করতে দিল না তারা। তারা শুনল না আমার কথা। তারা ধেয়ে আসছে! যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ। আমি বুঝতে পেরেছি আমার সামনে বিপদ। তবু আমি শেষবারের মতো হেঁকে উঠলুম, "আমি তোমাদের সম্রাট। আমার রক্তে আছেন সূর্যদেবতা। দেবতা রে। তোমরা যেখানে আছ ওখান থেকে আর এক-পাও এগোবে না, এই আদেশ।"

কিন্তু হায়! আমার এ-আদেশ ওদের সেই কান-ফাটা চিৎকারে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। আজ বুঝি ওদের কাছে সম্রাটের আর কোনো মূল্য নেই। ওরা বিশ্বাস করেছে, আমার কোলে এই যে মেয়েটি, এর পাপেই আজ প্রকৃতির এমন ভয়াল চেহারা! নীলনদের এমন ভয়ংকর রূপ! ওরা বাঁচতে চায়। ওরা জেনেছে, নীলনদ এই

মেয়েটিকে পেলেই শান্ত হবে। সুতরাং সম্রাটের চেয়ে নিজের প্রাণ তাদের কাছে অনেক প্রিয়। তারা শুনবে না কারো কোনো কথা। ওরা এই মেয়েকে ছিনিয়ে নিতে এগিয়ে আসছে! জনতার সে কী মূর্তি! সে কী রোষ!

আমি জুয়ামের মুখের দিকে ক্ষণেকের জন্যে তাকালুম। কী শান্ত তার চোখের চাউনি! কী নির্ভয় সেই দৃষ্টি! যেন সে মরতে ভয় পায় না। কেন পাবে! যে মরতে-মরতে বেঁচে উঠেছে, তার মরতে ভয় কী? কিন্তু তার মুখখানা দেখে আমার মনের ভেতরটা ছটফটিয়ে চিৎকার করে উঠল, "আমি জুয়ামকে মরতে দেব না, মরতে দেব না!"

আমার মনের এই আর্তনাদ কারোর শোনার কথা নয়। আমি আর একদণ্ডও দেরি না করে, জুয়ামকে আমার বুকের আড়ালে আগলে নিয়ে দূরন্ত বেগে ছুটে পালালুম, প্রাসাদের এই চত্বরটা পেরিয়ে আর-এক চত্বরে।

ওরাও ছুটল আমার পেছনে।

আমি প্রসাদের এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে ছুটে পালাই।

ওদের চোখে ধাঁধা লেগে যায়!

কিন্তু যে-জনতা মারমুখী, হিংস্র, সে-জনতা কোনো ধাঁধাই গ্রাহ্য করে না। যেমন করে হোক সে তার কাজ হাসিল করবে। সুতরাং তারা অত বড় প্রাসাদের অত সৌন্দর্য সব তছনছ করে দিল। প্রাসাদের দেওয়ালে-দেওয়ালে খোদাই করা সোনা-সাজানো মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করে ধুলোয় মিশিয়ে দিল। ভাঙল তারা সুন্দর-সুন্দর পাথরের তৈরি পুতুলগুলি। জনতার আক্রোশে প্রাসাদের কারুকার্যখচিত বড়-বড় স্তম্ভগুলি খড়কুটোর মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তারা সেই ভাঙা স্তম্ভের টুকরোগুলো তুলে নিয়ে ছুঁড়তে থাকল আমার দিকে। ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে আসছে সেই পাথর।

বুঝতেই পারছ, কী বিশাল প্রাসাদ। এ যেন ছুটেও শেষ হয় না। শেষ নেই জনতার। ওই উড়ন্ত পাথরেরও। ওরা আমাকেই

মারতে চাইছে। ওরা জানে, আমি ঘায়েল হয়ে মাটিতে পড়লে, জুয়ামকে ছিনিয়ে নিতে পারবে আমার কাছ থেকে। সুতরাং আমাকে পালাতে হবে প্রাসাদের গোপন পথ দিয়ে। সুড়ঙ্গ পেরিয়ে। সেই গোপন পথের হদিস কেউ জানে না। জানি আমি, আর আমার বিশ্বস্ত ক'জন অনুচর। আমি সেই গোপন পথের দিকেই ছুটলাম। ওরাও আমাকে অনুসরণ করল। আমাকে লক্ষ করে সে কী চিৎকার! সে কী পাথরের বৃষ্টি! কিন্তু এমনি আমার দুর্ভাগ্য, আমি যখন সেই গোপন-পথে প্রায় পা দিয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে, আঃ! একটা পাথর ছিটকে এল। লাগল আমার মাথায়। আমি টলে টাল খেয়ে পড়ে গেলুম সেই গোপন-পথের সুড়ঙ্গের মুখে। আমার সঙ্গে পড়ল জুয়ামও। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি যাতে ওর আঘাত না লাগে। হয়তো লাগেনি। কিন্তু নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে আমি আবার যেই উঠে দাঁড়িয়েছি জনতা তখন আরও কাছে চলে এসেছে। এবার বুঝি আর পারলুম না জুয়ামকে বাঁচাতে! এবার ওদের পাথর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার নয়। আমার ঘাড়ে-পিঠে প্রচণ্ড আঘাত করে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি যুঝতে চেষ্টা করছি প্রাণপণে। বুঝিবা মিথ্যে হয়ে গেল আমার সব চেষ্টা। আমার মাথায় লেগেছে সে-পাথর। আমার মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে। আমার মুখে লেগেছে পাথর। আমার মুখের ভেতর থেকে রক্ত ঝরছে! আমার একটা চোখে লেগেছে পাথর। আমি আর চাইতে পারছি না সে-চোখে। তবু এখনও আমি ছাড়িনি জুয়ামকে আমার বুকের আশ্রয় থেকে।

ওরা সুড়ঙ্গের কাছাকাছি চলে এসেছে প্রায়। ওরা দেখে ফেলেছে সুড়ঙ্গের গোপন পথটা। এখন বাঁচতে গেলে সুড়ঙ্গের ফটকটা বন্ধ করতে হয় আমায়। কিন্তু আমি পারব কেমন করে! আর তো আমার শক্তি নেই। তবু শেষ চেষ্টা করতে হবে আমায়। হ্যাঁ, তাই, আমি মরতে দেব না জুয়ামকে, আমি তাকে বাঁচাবই!

এই প্রতিজ্ঞায় মন ভরে যেতে, কে যেন আমায় এক অদৃশ্য শক্তির

ক্ষমতা দিল সেই মুহূর্তে। আমি এক হাতেই সেই বিরাট ফটকের পাল্লায় টান মারলুম। ওরা ছুটে আরও কাছে আসার আগেই ফটকের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি মস্ত খিলটা এঁটে দিতে পেরেছি ফটকের গায়ে। ওরা লাফিয়ে পড়ল ফটকের ওপর। কিন্তু ততক্ষণে আমি সুড়ঙ্গের অন্ধকারে নেমে গেছি। কিন্তু আমি আর না পারছি ছুটতে, না পারছি হাঁটতে। আমি অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছি আর শুনছি ওরা ফটক ভাঙার জন্যে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। আমি সুড়ঙ্গের সেই জমাট অন্ধকারেই বসে পড়লুম। তারপর শুয়ে পড়লুম। অসহ্য যন্ত্রণায় আমি ছটফট করতে-করতে জুয়ামের মুখখানি দেখার জন্যে অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলুম। বোধ হয়, তাকে আর আমি বাঁচাতে পারব না। বোধ হয় এখনই ওই বিশাল জনতা সুড়ঙ্গের দরজা ভেঙে ফেলবে! তাই কি ভয় পেয়েছে জুয়াম? তাই কি সে কথা বলছে না?

আমি অনেক কষ্টে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক দিলুম, "জুয়াম।"

বুঝি-বা চমকে উঠল জুয়াম।

আমি বললুম, "ওরা সুড়ঙ্গের ফটক ভাঙছে।"

জুয়ামের চোখ-দুটি জ্বলে উঠল।

"হয়তো আমারও সময় শেষ হয়ে আসছে।"

জুয়াম ব্যস্ত হয়ে তাকাল আমার দিকে।

"এই সুড়ঙ্গের পথ ধরে তুমি এখান থেকে চলে যাও।"

জুয়াম আমার বুকের ওপর মাথা রাখল।

"ওরা তোমাকেও বাঁচতে দেবে না, জুয়াম।"

চকিতে আমার বুকের ওপর থেকে মাথা তুলে চেয়ে দেখল সেই গভীর অন্ধকারের দিকে। যেন ভয় পায় না সে মরতে।

"আমি আহত। আমি তো আর পারব না ওদের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে।"

জুয়াম উঠে দাঁড়াল। যেন সে সুড়ঙ্গের ওই ফটকের দিকেই যেতে চায়।

"জুয়াম।" আমি ব্যস্ত হয়ে ডাক দিলুম।

অন্ধকার থেকে সে ফিরে তাকাল আমার দিকে।

"আমার কাছে এসো জুয়াম।"

জুয়াম আবার বসল।

আমি ওর হাতটি ধরলুম। ভারী দৃঢ় সে-হাত।

আমি ওর মুখখানি দেখার জন্যে চোখ মেললুম। অস্পষ্ট আবছা মুখখানি দেখতে-দেখতে আমার চোখে জল এল। জুয়াম ব্যস্ত হয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে হাত দুটি বাড়িয়ে দিল। আমার কান্না থামল না। সে এতক্ষণে কথা বলল। ধরা-ধরা গলায় সে জিজ্ঞেস করল, "কাঁদছ কেন সম্রাট?" বলে আমার বুকে মাথা ঠেকাল।

আমি তখন জুয়ামের মুখখানি আমার চোখের কাছে টেনে এনে বললুম, "আমি যে জীবনের শেষ সময়েও জুয়ামের একটি গান শুনতে পেলুম না।"

একটি বন্দী পাখির মতো জুয়াম ছটফটিয়ে উঠল। কেননা, জনতা চিৎকার করছে দ্বিগুণ জোরে। ফটক ভাঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে-শব্দ আরও তীব্র।

আমি ব্যস্ত হয়ে জুয়ামকে জড়িয়ে ধরলুম। বললুম, "জুয়াম, ওরা এখুনি এসে পড়বে। সুড়ঙ্গের ফটক ওরা ভেঙে ফেলবে। তুমি চলে যাও জুয়াম। সুড়ঙ্গে লুকিয়ে পড়ো।"

জুয়াম ভয় পেল না। বললে, "না। তোমায় যদি ওরা বাঁচতে না দেয়, আমিও বাঁচতে চাই না। তোমায় আমি গান শোনাব সম্রাট।" বলতে-বলতে আমার বুকে মাথা রেখে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল জুয়াম।

জনতার গর্জন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। অন্ধকার সুড়ঙ্গের পথ কেঁপে-কেঁপে উঠছে। ঠিক এমনই সময় জুয়ামের ঠোঁট দুটিও কেঁপে উঠল। আমার বুকে মাথা রেখে গেয়ে উঠল জুয়াম।

আঃ! এ কী গান! এ যেন জ্যোৎস্নার আলোর মতো নরম! পাখির কান্নার মতো মিষ্টি! পুবের হাওয়ার মতো দোদুল! গানের সুরঝরনা জুয়ামের গলা বেয়ে যতই ঝরে-ঝরে পড়ছে, বুকের ভেতরটা আমার ততই যেন শান্ত হয়ে আসছে। রোমাঞ্চে শিহরণ লাগছে। দেবতা 'থথ'কে মনে-মনে ডাক দিলুম। বললুম, "হে দেবতা, তোমার শেষ আদেশটি আমি রক্ষা করতে পেরেছি। এবার আর মরতে আমার বাধা কোথায়? আমায় এবার তোমার কাছে ডেকে নাও।"

ভয়ংকর আর্তনাদ তুলে সুড়ঙ্গের ফটক ভেঙে ফেলেছে জনতা! আঃ! এইবার বুঝি আমার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এল! কিন্তু জুয়াম! তাঁকেও যে বাঁচানো গেল না! ওই সেই জনতা এগিয়ে আসছে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চিৎকার করতে-করতে!

কিন্তু এ কী! ওদের গর্জন যেন ধীরে-ধীরে থেমে আসছে!

ওই ভয়াবহ হিংস্র মুখগুলো যেন কী এক জাদুর মন্ত্রে হতবাক হয়ে গেল! ছুটতে-ছুটতে তারা দাঁড়িয়ে পড়ছে! পাষাণের মতো নিথর! নিশ্বাসের শব্দটুকু পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। হাজার হাজার মানুষের হিংসুটে চোখগুলো অবাক হয়ে চেয়ে আছে জুয়ামের মুখের দিকে। তাদের কানে বুঝি পৌঁছে গেছে জুয়ামের গানের সুর! তাদের হাতের অস্ত্রগুলি হাতের মুঠিতে লুকিয়ে পড়েছে বুঝিবা লজ্জায়! ওরা যেন গানে-গানে মন্ত্রমুগ্ধ! এই মুহূর্তে ভুলে গেছে প্রতিহিংসা নেবার কথা! ভুলে গেছে, প্রধান-পুরোহিতের সেই কথা, এই ছোট্ট মেয়েটি পাপী। অথবা ভুলে গেছে, ওকে নীলনদের জলে ছুঁড়ে না ফেললে নীলের রোষ থামবে না! দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে! এ যেন মিথ্যে, সব মিথ্যে হয়ে গেছে ওদের কাছে—জুয়ামের গানের শব্দে।

গাইতে-গাইতে উঠে দাঁড়াল জুয়াম। গাইতে-গাইতে হেঁটে গেল জুয়াম ওই জনতার মধ্যে। না, ওরা ওকে আঘাত করল না। ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে ছুটল না নীলনদের তীরে। তারা পথ ছেড়ে দিল

জুয়ামের জন্য। জুয়াম সুড়ঙ্গের পথ ধরে গাইতে-গাইতে এগিয়ে চলল। আশ্চর্য! ওরাও যে হেঁটে চলেছে জুয়ামের পিছু-পিছু।

আর আমি! কী জানি কী মনে করল ওই অজস্র মানুষের একাংশ! তারা তাদের সম্রাটকে মাটির ওপর থেকে তুলে নিল। তারা সযত্নে আমাকেও নিয়ে চলল ওই জনস্রোতের পিছু-পিছু! যে-জনস্রোত এখন আর বিদ্রোহী নয়। ঠিক যেন বিধ্বংসী ঝড়ের শেষে এক শান্ত আকাশ। কিম্বা হালকা বাতাসের ঢেউ!

জুয়াম গান গাইছে। ওই সুড়ঙ্গের পথ পেরিয়ে এখন সে খোলা আকাশের নীচে। চেয়ে ছাখো, যে-দুর্যোগ এতক্ষণ আকাশ ছেয়ে ছিল, ধীরে-ধীরে সে যেন ওই গানের সুরে দূরে পালাচ্ছে! ঘূর্ণিঝড়ের ঝাপটা মেরে যে বাতাস এতক্ষণ মানুষের ঘর ভাঙছিল, প্রাণ নিচ্ছিল! সে যেন আস্তে-আস্তে শান্ত হয়ে যাচ্ছে। নীলনদের বুকের ওপর যে-তরঙ্গ উত্তাল হয়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল, এখন কেমন ধীর-স্থির হয়ে কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে! সত্যিই কি ওর গানে তবে জাদু আছে? তবে কি জুয়াম মানুষ না? সে কি সত্যিই দেবতার শ্রেষ্ঠ সন্তান! অথবা আশ্চর্য এক জাদুকরী! নইলে ওই মারমুখী জনতা ওর গান শুনতে-শুনতে বেবাক হয়ে যায় কেমন করে!

মেঘে ঢাকা আকাশে আবার সূর্যদেব দেখা দিলেন। তাঁর আলো ছড়িয়ে পড়ল আকাশ থেকে মাটিতে। খুশিতে ভরে গেল চারিদিক। ক্রুদ্ধ জনতা তাদের হাতের অস্ত্রগুলি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠল জুয়ামের। সেই জয়ধ্বনি শুনতে-শুনতে কেঁদে ফেলে জুয়াম। তার কান্না দেখে অসংখ্য জনতার চোখেও জল। তারা চেঁচিয়ে ওঠে, "জুয়াম, জুয়াম, তুমি আমাদের স্বর্গ, তুমি আমাদের জীবন, তোমাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব আমাদের ঘরে-ঘরে।"

জুয়ামের জয়ধ্বনি দিতে-দিতে ফিরে গেল জনতা যে-যার ঘরে। আর প্রধান-পুরোহিত কালো মুখ আরও কালো করে ভাবতে বসলেন, এবার কী করি!

সাত

আমার আহত দেহটা বয়ে বয়ে ওরা প্রাসাদে নিয়ে এল। আমার ওঠার শক্তি নেই। আমাকে শুইয়ে দিল ওরা আমার বিছানায়। ফিরে এল জুয়াম আমার পাশে। সে জনতাকে জয় করে ফিরেছে। কিন্তু সে জয়ের আনন্দ নেই ওর মুখে। আমার মাথায় হাত রাখল সে। আমার মুখে হাসি ফুটল। কিন্তু হাসল না জুয়াম। কেমন যেন একটা ভয়ের ছায়া ওর সারা মুখখানি ঢেকে রেখেছে! ও বুঝি ভয় পাচ্ছে আমাকে দেখে! ভাবছে বুঝি আমি বাঁচব না আর!

আমি অনেক কষ্টে কথা বলতে পারলুম। অস্ফুট স্বরে বললুম, "জুয়াম, তুমি জিতেছ।"

জুয়াম বললে, "না সম্রাট, এখনও আমি জিতিনি।"

"কেন বলছ ও-কথা?"

"সম্রাট, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি আহত। তোমার বীরত্ব আমার প্রাণ রক্ষা করেছে। এখন আমি যদি তোমাকে ভাল করে তুলতে না পারি, আমি মনে করব, আমার এ-জয় জয় নয়।"

"জুয়াম, আমি যদি আর কোনোদিন ভাল না হয়ে উঠি?"

"না না, অমন কথা বোলো না সম্রাট! আমি তোমাকে গান শোনাব, চিরদিন শোনাব।

"যতদিন না তুমি ভাল হও। তারপর ভাল হয়ে উঠে যেদিন তুমি আদর করে বলবে 'জুয়াম, আমার ছোট্ট মেয়ে', সেদিন আমার ছুটি।"

আমি নিঃশব্দে হাসলুম।

হ্যাঁ, জুয়াম আমায় গান শোনাত। এই যে আহত হয়ে আমি বিছানায় শুয়ে আছি, এই যে মুমূর্ষু, তাকে প্রাণ ঢেলে সে গান শুনিয়েছে। ভোরের আকাশে আলো ফুটলে সে বাগানে যেত। সেই

তার ছোট্ট বাগান। অনেক গাছের একটি গাছে যে-ফুলটি সবচেয়ে বড় হয়ে ফুটে উঠত, সেটি সে তুলে নিত। ফুলটি নিয়ে আমার ঘরে আসত। আমার কাছে বসত। আমার হাতে ফুলটি তুলে দিয়ে ধীর-শব্দে গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠত। গাইতে-গাইতে আমার কপালে হাত রাখত। গান শেষ করে জিজ্ঞেস করত, "কেমন আছ সম্রাট ?"

আমি কী বলব ভেবে পেতুম না। অনেক কষ্টে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতুম, "ভাল।"

রাতের বেলা সারা ঘরে জুয়াম নিজের হাতে চন্দন-গুঁড়ির সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে আমার মাথার কাছে বসত। আঃ, কী মিষ্টি সে-গন্ধ! সেই হাওয়ার সঙ্গে দুলতে-দুলতে জুয়াম গান শোনাত। আমি অবাক হয়ে ভাবতুম, ওই চন্দনের সুবাসের চেয়েও বুঝি-বা জুয়ামের এ-গান আরও মিষ্টি, আরও মধুর। সেই গান শুনতে-শুনতে, যন্ত্রণায় কাতর আমি কখন যেন ঘুমিয়ে পড়তুম। হয়তো আমার ঘুমন্ত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করত, "ঘুমোলে সম্রাট ?"

আমার উত্তর পেত না।

এমনি করে রোজ ভোরবেলা সে একটি করে ফুল তুলে আনে তার সেই ছোট্ট বাগান থেকে, সেটি আমার হাতে দিয়ে আমায় গান শোনায়। সকালের ঘুম-ভাঙা চোখে তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখি আর ভাবি, জুয়ামের সকাল শুরু হল। আমার বেলা বুঝি শেষ হয়ে আসে।

এমনি করে রোজ রাতের বেলা সে চন্দনের গুঁড়ি ছড়িয়ে গান গায়। আমার চোখে ঘুম আসে। ঘুমচোখে জুয়ামের আবছা-আবছা মুখখানি দেখতে-দেখতে মন বলে, শেষদিনের ঘুম বুঝি ঘনিয়ে আসছে আমার। পৃথিবী বুঝি অন্ধকার হয়ে এল।

কতদিন যে এমনি করে গাইল সে। কত ভোর চলে গেল। কত রাত বয়ে গেল। কিন্তু পারল না জুয়াম। পারল না তার সম্রাটকে ভাল করতে। আজ সে জেনে ফেলেছে, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে

এসেছে। তাই সে শেষবারের মতো সেদিন আকুল হয়ে গেয়ে উঠেছিল। তার সে-গান শুনে ছুটে এসেছে সারা দেশের মানুষ আর মানুষ। তারা বুঝি ওই গানের আকুলতায় বুঝেছে, সম্রাট তাদের ছেড়ে যাবে! তাই তাদের চোখে জল! আজ যদি আমি একবার এই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতুম! আমার শেষ-নিশ্বাস পড়ার আগে জুয়ামকে সঙ্গে নিয়ে যদি ওই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বলতে পারতুম, "জুয়াম, ছ্যাখো, প্রাসাদের বাইরে কত লোক! ওরা তোমার গান শুনছে জুয়াম। ওরা তোমাকে ভালবাসে।" কিন্তু বলতে পারিনি। কেননা, আমার এইমাত্র মৃত্যু হয়েছে।

হ্যাঁ, আমার মৃত্যু হয়েছে। তার আগের কথা বলি। আজ সকালে প্রতিদিনের মতো জুয়ামের হাত থেকে ফুলটি নিতে পারিনি আমি। আমি ক্ষীণ চোখে চেয়ে-চেয়ে দেখছিলুম তার দিকে, সে গানই গাইছে। আমার বুকের ভেতরটা থেকে-থেকে কেমন যেন ব্যথায় কেঁপে উঠছিল। আমার নিশ্বাসের শেষ শব্দটা থেমে যেতেই আমার মনে হল, এই শূন্য হাওয়ায় আমি ভেসে বেড়াচ্ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার দেহটা নিশ্চল হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। আমার মনে হল, এরই নাম বুঝি মৃত্যু। বিছানায় পড়ে আছে ওই যে দেহটা, আমি বুঝি ওই মৃত-মানুষটার আত্মা!

এখন তার গান থেমে গেছে। এখন সে কেঁদে উঠছে। কেঁদে উঠেছে মানুষের সঙ্গে মানুষ। কাঁদছে প্রাসাদের প্রতিটি প্রাণ। এ-প্রাসাদের আর কী দাম আমার কাছে! ওই সোনার সিংহাসনে আর আমি বসব না কোনদিন। আর কেউ মনে করবে না, আমি তাদের সম্রাট, দেবতা। বহুমূল্য রাজপোশাক পরে আমি আর মাথায় দেব না সোনার মুকুট। আমি এতদিন ধরে যে অজস্র মণি-মুক্তার ভাণ্ডার গড়েছিলুম, একমুহূর্তে তা মিথ্যে হয়ে গেল আমার কাছে।

কিন্তু আশ্চর্য, মৃত্যু হলেও আমি সব দেখতে পাচ্ছি। কত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সারে-সারে প্রাসাদের চারিপাশে। অগণ্য অসংখ্য

তারা। তারা আজ শেষবারের মতো দর্শন করবে তাদের সম্রাটকে। তার পায়ের কাছে নিমেষ দাঁড়িয়ে মনে-মনে বলবে, "আমাদের ক্ষমা করো সম্রাট।" কেননা, একটি ছোট্ট মেয়েকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তারা ক্রুদ্ধ হয়ে পাথর ছুঁড়ে আঘাত করেছিল তাদের সম্রাটকে। আর সেই আঘাতের যন্ত্রণাই সম্রাটকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর দিকে। যে আশ্চর্য মেয়ে তার গানের জাদুমন্ত্রে ওই নীলনদের উত্তাল তরঙ্গ শান্ত করেছিল, শান্ত করেছিল বুক-কাঁপানো ঝঞ্ঝা-ঝড়, সেও পারল না তার সম্রাটকে বাঁচাতে।

আহা! কী আকুল হয়ে কাঁদছে ওই ছোট্ট মেয়ে জুয়াম। যেদিন আমার যুদ্ধের আগুনে ওর মা-বাবাকে হারাল, সেদিন ঘৃণায় ধিক্কার দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল সে। বলেছিল, আমি ঘাতক। আর আজ? সে জেনেছিল, আমি তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমি ঘাতক নই। সে জেনেছে, যে-আগুন সম্রাট জ্বালিয়েছিল, তা নেহাতই ভুল করে। একটা নিছক অঘটন। নইলে যার প্রাণে এত স্নেহ, সে কখনও ঘাতক হতে পারে?

হ্যাঁ, ঠিকই জেনেছিল জুয়াম, আমি ঘাতক নই। বিশ্বাস করে আমার বুকের সব মমতা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলুম জুয়ামের জন্যে।

হ্যাঁ, তাই বুঝি ও তার মা-বাবাকে হারানোর ব্যথা ভুলে খুঁজে পেয়েছিল আমার মধ্যে তার আপনজনকে!

আট

আমাদের প্রথা অনুযায়ী আমার মৃতদেহটিকে 'মমি' করা হবে এখন। আমি শুনতে পাচ্ছি, মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে রাজ-পুরোহিতদের কণ্ঠে। আমি দেখতে পাচ্ছি, মন্ত্রের সঙ্গে-সঙ্গে আমার অন্তঃকরণটি ছাড়া আমার দেহের ভেতর থেকে অপ্রয়োজনীয় সবকিছু বার করে পরিষ্কার করা হচ্ছে। এমন কী আমার মাথার ভেতরটাও বাদ গেল না। পরিষ্কার করার পর কত রকম সুগন্ধী গাছ-গাছালির ওষুধ আমার দেহের ভেতরে

বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া হল। তারপর নানান ওষুধে পাটবস্ত্র চুবিয়ে-চুবিয়ে আমার দেহটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলা হবে। সেই সব পাটবস্ত্রের থাকে-থাকে লেখা থাকবে মন্ত্র। আর সেই মন্ত্র পাঠ করবেন দেশের অগণিত পুরোহিতের দল। এমনি চলবে সত্তর দিন ধরে।

এদিকে আমার মৃতদেহটিকে সযত্নে সমাধিস্থ করার জন্য তৈরি হল শবাধার। দেশের বড়-বড় শিল্পীরা এসেছেন সেই শবাধার তৈরি করার জন্য। আমার শবাধারটি গড়া হল আমার মৃতদেহের ঠিক মাপে-মাপে। সেই সোনার শবাধারে কতরকম মণি-পাথর গেঁথে-গেঁথে কী সুন্দর যে সব শিল্পকাজ হল, তা দেখলে তোমাদেরও চোখ ঝলসে যাবে।

এরই মধ্যে আমার দেহকে সমাধি দেওয়ার জায়গাটিও ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের বিশ্বাস ছিল, মরুভূমির রুক্ষ বালির নীচে যদি মৃতদেহকে সমাধি দেওয়া যায়, তবে মরুর সেই শুষ্কতায় দেহের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কম। সেইভাবে আমার দেহও সমাধি দেওয়ার জন্য মরুর বুকে হাজার-হাজার লোক কাজে নেমেছে। ওই সমাধির ওপর গড়া হবে পিরামিড। তোমরা যাকে বল, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য। ওর নীচে যে শুধু আমার মৃতদেহটাই 'মমি' করে রাখা হবে, তাই না, আমার প্রিয় জিনিসগুলিও রাখা হবে। থাকবে আমার প্রিয় খাবার। রাখা হবে সোনার কাজের নানান আসবাব। কত রত্ন-খচিত আধার। শিল্পকাজে ভরপুর চমৎকার সব ফুলদানি। রথ। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র। বড় পালঙ্ক। পালঙ্কের চারপাশটি থাকবে সোনায় মোড়া। তার গায়ে অদ্ভুত সব মূর্তি। কত রকমের মুখোশ। সেই সঙ্গে আর থাকবে আমার নিজের একটি বড় মূর্তি। কালোপাথরে খোদাই করা! সেই মূর্তিটিকে সম্রাটেরই মতো সাজানো হবে। মাথায় থাকবে মুকুট। সারা গায়ে সোনা আর নীলকান্তমণির অলংকার। সমাধির নীচে আর-সব দেবতার মূর্তির সঙ্গে থাকবে মৃত্যুর দেবতা ওসাইরিসের একটি মূর্তি। প্রতিদিন তাঁদের পূজা করা হবে এই সমাধির নীচে। সেই সঙ্গে সেই দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করা হবে আমার আত্মার মঙ্গলের জন্য।

আমাদের বিশ্বাস ছিল, মানুষের মৃত্যু হলেও তার দেহটি যতদিন সযত্নে রক্ষা করা হবে, তার আত্মাও ঠিক ততদিন থাকবে। সুতরাং সেই আত্মার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখার জন্য, সেবা-যত্ন করার জন্য, আনন্দ দেবার জন্য প্রতিদিন যে-মানুষগুলি আমার কাছে-কাছে ছিল, আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাদেরও হত্যা করে 'মমি' করা হবে। তাদের দেহগুলিকে রাখা হবে, এখানে আমার সঙ্গে, আমারই সমাধির কাছাকাছি। সুতরাং ঘোষণা করা হল, যে ছোট্ট মেয়ে জীবিত অবস্থায় সম্রাটকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিল, যার প্রতি সম্রাট তাঁর স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন, সেই জুয়াম ও তার বৃদ্ধা দাসীকেও 'মমি' করে এখানে সম্রাটের মৃতদেহের পাশে রাখা হবে। রাজ-পরিবারের সঙ্গে জুয়ামের যদিও কোনো সম্পর্ক নেই, তবু তাকে এ-সম্মান দেওয়া হচ্ছে, সম্রাটেরই ইচ্ছায়। কেননা, তিনি চেয়েছেন, জীবিত অবস্থার মতো মৃত অবস্থাতেও জুয়াম তাঁকে যেন গান শোনায় ওই সমাধিতে। এ ছিল মৃত্যুর আগে সম্রাটের শেষ আদেশ। আর এ-আদেশ তিনি শুনিয়ে গেছেন রাজ-পুরোহিতকে।

শোনো তোমরা, শোনো, আমিই সম্রাটের মৃত-আত্মা। আমি চিৎকার করে বলছি, এ মিথ্যা কথা। এ জঘন্য মিথ্যা, মিথ্যা। এ আদেশ করিনি। এও কুচক্রী মানুষগুলোর মন-গড়া কথা। মনে আছে তোমাদের সেই দিনের কথা, যেদিন প্রধান-পুরোহিত মিথ্যা দোষারোপ করে ওই হতভাগ্য মেয়েটিকে প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিল ? সেদিন এই আমার আদেশে তার মতলব ব্যর্থ হলে সেই পুরোহিত তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। বলেছিল, সে ডাইনি। আর আজ ? আজ আবার আর-এক-বীভৎস ষড়যন্ত্র এঁটে, আর-এক মতলব নিয়ে এসেছে ওই মেয়েটিকে হত্যা করতে। জুয়ামকে যারা ডাইনি বলেছে, তারা নিজেরাই হিংসুটে দানব! তারাই খুনি। কেননা, আমার আত্মাকে তৃপ্ত করার নামে ওই ছোট্ট মেয়েটিকে খুন করে তাকে প্রাসাদ থেকে সরিয়ে ফেলতে চায়! না, এ হতে

পারে না। আমার কথা শোনো তোমরা, ওকে হত্যা করলে আমি শান্তি পাব এ-কথা যে বলে, সে মিথ্যে বলে। না, জুয়ামকে তোমরা হত্যা করতে পারবে না। জুয়ামকে আমি হত্যা করতে দেব না, কিছুতেই না।

কিন্তু কেমন করে? তা তো আমি জানি না। যখন আমার দেহে প্রাণ ছিল, তখন আমার ক্ষমতাও ছিল। তখন আমি ছিলুম সম্রাট। আজ আমি মৃত। আমি কেমন করে পারব ওকে রক্ষা করতে! আমি কেমন করে বলব মানুষের কানে-কানে, এক মৃত-আত্মাকে তৃপ্ত করার জন্য অন্যকে হত্যা করা নিষ্ঠুর অপরাধ। এ নিছক অন্ধবিশ্বাস। হত্যা নয়, হত্যা নয়। কখনই নয়।

আহা! জুয়াম আমার ছোট্ট মেয়ে! আহা! সে যে এই সুন্দর পৃথিবীর আর-এক সৌন্দর্য। আমি কাকে বলব এই কথাটা যে, জুয়াম যতদিন এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে খেলে বেড়াবে, নিশ্বাস নেবে, যতদিন আনন্দ আর খুশিতে সে গান গাইবে, তার গান শুনতে-শুনতে যখন মুগ্ধ মানুষের দু'চোখে অশ্রুধারা বয়ে যাবে, তখনই আমি পাব শান্তি। সেই আমার সুখ, আমার তৃপ্তি। হত্যা নয়! হত্যা নয়! কাকে বলি, তোমরা আমার মৃতদেহটা নিয়ে যতই যত্নে ওই মরুর নীচে সমাধি দাও, যতই সমাধির মধ্যে রাশি-রাশি ধন-রত্ন ছড়িয়ে রাখো, যত উঁচুই পিরামিড গড়ো সেই সমাধির ওপর, এ-সবই মিথ্যা। হে বন্ধু, ওই ছোট্ট মেয়েটিকে হত্যা করে ওই অন্ধ গহ্বরে পুঁতে রাখলে সে আমায় গান শোনাবে না। হত্যার রক্তে তোমাদের হাতই শুধু কলঙ্কিত হবে। সুতরাং একটু দাঁড়াও! ওর মুখের দিকে একটু চেয়ে ছাখো! আহা! দেখতে পাচ্ছ না, কী অসহায় ওর চোখ দুটি। কী নিষ্পাপ মুখখানি। দেখতে পাচ্ছ না, দেবতা 'থথ'-এর আশীর্বাদ ওর কপালে ছুঁয়ে আছে!

তোমরা দেখতে পাবে না। কারণ, তোমরা অন্ধ। তোমরা ওকে হত্যা করবেই। কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করলুম, আমি ওকে তোমাদের হাত থেকে বাঁচাবই।

আমি জানি, এই কাজটা করতে আমার যা-কিছু করার দরকার তা এখনই শুরু করে দিতে হবে। কেননা, ওদের হাতের অস্ত্র যে-কোনো মুহূর্তে ঝনঝনিয়ে বেজে উঠতে পারে। যে-কোনো মুহূর্তে জুয়ামের প্রাণটি ওরা ছিনিয়ে নিতে পারে। দেরি হয়ে গেলে আর যে আমার কিছুই করার থাকবে না। তবু আমায় অপেক্ষা করতে হয়েছিল রাতের অন্ধকারের জন্য।

অন্ধকার এসেছিল। নিজের ঘরে, বৃদ্ধা দাসীর কোলের কাছে ঘুমিয়ে পড়েছিল জুয়াম। তখনও দাসী জেগে। সে জানত, তার মৃত্যু এগিয়ে আসছে। তাই বুঝি সে অন্ধকারে বন্ধ চোখে বসে-বসে ভাবছিল, মৃত্যুও কি অন্ধকারের মতো কালো! ঠিক এই সময়েই আমি নিঃসাড়ে তার ঘরে ঢুকে পড়লুম। খুব নরম গলায় ডাক দিলুম, "দাসী!"

ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছিল দাসী। হয়তো আমার কণ্ঠস্বর সে চিনতে পেরেছিল। তাই ভয়ে প্রায় আঁতকে উঠেছিল সে।

আমি তাই দেখে সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠেছি, "ভয় পেও না। হ্যাঁ, আমি সম্রাট। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করতে আসিনি। আমি এসেছি তোমাদের বাঁচাতে।"

দাসী হতবাক হয়ে চেয়ে রইল সেই অন্ধকারের দিকেই। কেননা, সে ভাবছে বুঝি এই ঘর-জোড়া অন্ধকারটাই মৃত-সম্রাট!

আমি বললুম, "দাসী, তোমার কি মনে হয় না, এই সুন্দর পৃথিবীতে তুমি আরো অনেকদিন বেঁচে থাকো? ছোট্ট মেয়ে জুয়ামের সুন্দর গান শুনতে-শুনতে ভোরের বেলা তোমার ঘুম ভাঙে, রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়ো? মনে হয় না, ওই আকাশ-রাজ্যের সূর্যদেবতা প্রতিদিন ভোরের আলোয় তোমায় আশীর্বাদ করেন? দেবতার পূজার প্রার্থনায় তুমি তাঁর জয়গান করো? তোমার কি ইচ্ছা করে না, আরও অনেকদিন এই পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখতে? দেখতে গাছের ফুল, অথবা রঙিন পাখি? নীলনদের কুলুকুলু কলতান? ঝুরু-ঝুরু বাতাস?

ঝড়ের তাণ্ডব অথবা বজ্রের গর্জন ? বৃদ্ধা দাসী, প্রাণ তোমার নিজের সম্পদ। সেই সম্পদে কারো অধিকার নেই। সে-অধিকার শুধু দেবতা ওসাইরিসের। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, ডেকে নেবেন সকলকে। কিন্তু তাই বলে কারো প্রাণ রাজ-পুরোহিতের নিষ্ঠুর আদেশে কেড়ে নেওয়া হবে, তা হতে পারে না। বলো তুমি, কেন তোমাকে হত্যা করা হবে ? বলো, কেন হত্যা করা হবে ওই ছোট্ট মেয়ে জুয়ামকে ? বলো বলো! তুমি কি বাঁচতে চাও না দাসী ? বাঁচাবে না ওই ছোট্ট অসহায় মেয়ে জুয়ামকে ? বলো তুমি, বলো ?"

"হ্যাঁ, আমি বাঁচতে চাই। হ্যাঁ, আমি বাঁচাব জুয়ামকে!" হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল দাসী। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আঃ! কী এক নিশ্চিন্ত আনন্দে আমার আত্মা তৃপ্ত হল। আমি বললুম "তবে কাঁদলে চলবে না দাসী। উঠে পড়ো। কোলে তুলে নাও জুয়ামকে। চলো আমার সঙ্গে।"

দাসী জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় ?"

আমি বললুম, "যেখানে মানুষ মানুষকে মারে না।"

দাসী বললে, "এই প্রাসাদের ভেতর থেকে আমাকে তো এরা বেরিয়ে যেতে দেবে না।"

"আমার পিছু-পিছু এসো। আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দেব!"

"আমি তো দেখতে পাচ্ছি না আপনাকে!"

"এই আমি একমুঠি বাতাস। তোমার সামনে বয়ে যাচ্ছি। এই বাতাস ছুঁয়ে-ছুঁয়ে তুমি এগিয়ে এসো।"

দাসী বুকে তুলে নিল জুয়ামকে। তারপর বাতাসের স্পর্শে-স্পর্শে এগিয়ে চলল। প্রাসাদের একটি করে দরজা খুলে দিই আমি, জুয়ামকে কোলে নিয়ে একটি করে দরজা পার হয়ে বেরিয়ে আসে দাসী। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে জুয়াম। তার মুখের কথা যেন হারিয়ে গেছে। আমি জানি, প্রাসাদের চারিদিকে প্রহরী। জানি, আমাকে তারা দেখতে না পেলেও, দাসীকে দেখতে পাবে! সুতরাং

চারিদিকে ওই যে আলোর বাতিগুলি জ্বলে আছে, ওগুলি এখুনি নিবিয়ে ফেলতে হয়। আমি নিমেষে হাওয়ার তুফান তুলে ওই আলোর গায়ে ধাক্কা দিলুম। ফুৎকারে নিবে গেল বাতিগুলি। সঙ্গে সঙ্গে জমাট অন্ধকারে ডুবে গেল প্রাসাদ। অস্থির হয়ে ছোটাছুটি লাগিয়ে দিলে রাতের প্রহরীরা। তারা চিৎকার করে উঠল, "আলো, আলো!" কে জানত আচমকা সব কটা বাতি একই সঙ্গে নিবে গিয়ে, এমন অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটবে! সেই অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সিং-দরজার বাইরে বেরিয়ে এল দাসী।

বেরিয়ে এলে আমি বললুম, "দাসী, তাড়াতাড়ি পা চালাও।"

কিন্তু বৃদ্ধা আর কত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে! তবু সে প্রাণপণে হাঁটে।

আমি বললুম, "দাসী, নীলনদের তীরে চলো।"

উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে দাসী বলল, "ওখানে কেন?"

আমি বললুম, "ওখানে নৌকো তৈরি আছে, তোমাদের নিয়ে যাবার জন্যে।"

দাসী নীলনদের দিকেই ছুটল। নীলনদের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সে নৌকোয় গিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি নৌকোর ভেতরে লুকিয়ে পড়তে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল ভয়ে! এ কী! নৌকোর ভেতরে যে রাজ-পুরোহিত। যেন তাদেরই অপেক্ষায় বসে আছেন! যেন তিনি আগেই জানতে পেরেছিলেন দাসী আর জুয়াম প্রাসাদ ছেড়ে যাবে। কিন্তু কেমন করে? কেমন করে আমার চোখকে তিনি ঠকিয়ে দিলেন! এ যে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

মুহূর্ত দাঁড়িয়ে যে নিশ্বাস নেবে দাসী, তা আর হল না। নৌকোর ভেতরে গা ঢাকা দিয়ে বসে ছিল দু-জন প্রহরী। নিমেষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা ওই বৃদ্ধা দাসীর ওপর। জুয়ামকে ছিনিয়ে নিল তার কোল থেকে। ছিনিয়ে দাসীকে ছুঁড়ে ফেলে দিল নীলনদের অতল জলে। দাসী কাঁদবারও সময় পেল না। তলিয়ে গেল জলের

তলায়। আমি হাহাকার করে চেঁচিয়ে উঠলুম। কিন্তু নীলনদের কল্লোল আমার কথা কেড়ে নিয়ে গর্জে উঠল।

সেই মুহূর্তে আমি পারতুম আমার অদৃশ্য শক্তি দিয়ে একটা অঘটন কিছু ঘটিয়ে দিতে। কিন্তু না। আমার মনে হল অতর্কিতে তেমন কিছু করে বসলে জুয়ামকেও ওরা নীলনদের জলে ডুবিয়ে দিতে পারে! সুতরাং জুয়ামকে বাঁচতে দাও। দেখি, ওরা কোথায় নিয়ে যায় জুয়ামকে।

আমি যা ভেবেছিলুম, ওরা তাই করল। ওই ছোট্ট মেয়ে জুয়ামকে ওরা বন্ধ কারাগারেই বন্দী করে রাখল। না, ছোট্ট এইটুকু ওই মেয়েটাকে কারাগারের অন্ধকারে ঠেলে ফেলে দিতে ওদের একটুও হাত কাঁপল না! ওদের শরীরে বুঝি দয়া-মায়া বলে কিচ্ছু নেই। সব বুঝি নিঃশেষ হয়ে গেছে!

আমি জানি, এই বন্ধ কারাগার থেকেই জুয়ামকে নিয়ে যাওয়া হবে সেই গোপন জায়গায়, যেখানে ওকে হত্যা করা হবে। কিন্তু আমি কী করব এখন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। কেননা, এই বন্ধ কারাগার ভেঙে ফেলার শক্তিও তো আমার নেই। তবে কি জুয়ামও শেষ হয়ে যাবে? মৃত্যু কি তার সামনে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছে? আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? অস্থির হয়ে উঠলুম আমি! ভাবতে লাগলুম, আমার সব ভালবাসা নিঃশেষ করে, আমার বুকের আদর ঢেলে ঢেলে যার মন জয় করেছিলুম, আবার যার গলায় ফিরে এসেছিল গান, দেবতা 'থথ'-এর সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানের গলার সেই সোনা-ঝরা গান কি তবে আর শোনা যাবে না?

আমি ছুটে গেলুম সেই মন্দিরে, দেবতা 'থথ'-এর কাছে। দূর থেকে তাঁকে বললুম, "হে দেবতা 'থথ', তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি সম্রাটের আত্মা। দেবতা, তুমি তো জানো, কেন আমার মৃত্যু হয়েছে! তুমি তো জানো, তোমার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে বাঁচানোর জন্যে। তার পরেও কেন আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি।"

"হ্যাঁ জানি।" দেবতা কথা বললেন।

আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে শিউরে উঠলুম। আমার আত্মা রোমাঞ্চিত হল। আমি শ্রদ্ধায় নত হয়ে বললুম, "তবে আমায় বলে দাও, এখন আমি কী করব ? বলো, কেমন করে জুয়ামকে আমি বাঁচাব। তুমি তো জানো, আমার শক্তি নেই, আমি অশরীরী।"

দেবতা বললেন, "হে অশরীরী সম্রাট, আমার কাছে অজানা কিছুই নেই। যে মানুষ 'থথ'-এর আদেশ পালন করার জন্য মৃত্যু বরণ করে, সে মহান। আমি জানি, তুমিই ছোট্ট মেয়ে জুয়ামকে বাঁচাতে পারবে ওই নির্দয় মানুষগুলোর হাত থেকে। সম্রাট, জুয়ামকে বাঁচানোর জন্য আমার ইচ্ছায় তুমি হবে একটি নিশাচর পাখি। সেই পাখির রূপ নিয়ে তুমি উড়ে যাবে জুয়াম যে কারাগারে বন্দী হয়ে আছে তার পিছন দিকে। সেখানে দেখবে কারাগারের ভেতরে আলো-বাতাস যাতায়াতের জন্য দেওয়ালের খুব ওপরে একটি খোলা অলিন্দ। সেই অলিন্দের ভেতরে তুমি ভেসে ভেসে প্রবেশ করবে। হে সম্রাট, তখন তুমি অশরীরী কোনো আত্মা নও। তখন তুমি আমার দূত। একটি পাখি। তুমি কারাগারের অন্দরে ঢুকে, ধীরে-ধীরে জুয়ামকে তুলে নেবে তোমার বুকে। সে যদি ভয় পায়, জিজ্ঞেস করে 'তুমি কে', তাকে বলবে, তুমি দেবতা 'থথ'-এর দূত। তারপর তাকে নিয়ে আসবে আমার কাছে। তাকে আমার কাছে নিয়ে এলেই তোমার ছুটি। এটি হবে তোমার শেষ কাজ। তারপর অশরীরী আত্মারূপেই তুমি এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে ঘুরে বেড়াবে।"

আমি 'থথ'-এর আদেশ-মতো নিশাচর পাখির রূপ নিয়ে উড়ে-উড়ে ভেসে গেলুম প্রাসাদের কারাগারের অন্দরে। তখন আমার বার-বার মনে হচ্ছিল, আমি যেন শুধু একটি পাখি নই। আমি এক দেবদূত! আমি উড়তে-উড়তে নেমে এলুম কারাগারের সেই অন্ধকারে। আহা! অন্ধকারে দেওয়ালে মুখ ঠেকিয়ে কাঁদছে জুয়াম ফুঁপিয়ে-ফুপিয়ে! আমাকে দেখে সে চমকে গেল। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে ?"

আমি বললুম, "হে আমার ছোট্ট বন্ধু জুয়াম, আমাকে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। আমি এক নিশাচর পাখি। আমি দেবতা 'থথ'-এর দূত। তিনি আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, তোমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য। হে বন্ধু, তুমি আমার কাছে এসো। তোমার দু-হাত দিয়ে আমাকে তুমি জড়িয়ে ধরো। আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব।"

আমার কথার কোনো উত্তর দিল না জুয়াম। চুপচাপ এগিয়ে এল। যেন এ তার জানাই ছিল। আমার বুকটা সে জড়িয়ে ধরল তার ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে। ধীরে ধীরে তাকে আকাশে তুলে নিয়ে, কারাগারের অলিন্দ পেরিয়ে আবার চলে এলুম দেবতা 'থথ'-এর সামনে। দেবতার সামনে দাঁড়িয়ে আমি জুয়ামের কপালে চুমু খেলুম শেষবারের মতো। অমনি সঙ্গে-সঙ্গে আমার সেই নিশাচর পাখির রূপ নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। জুয়াম চেঁচিয়ে আঁতকে উঠল, "কে ? বলে সে ছুটে পালাল দেবতার কাছে। ভয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরতেই দেবতা 'থথ' বললেন, "ভয় পেও না জুয়াম। উনি তোমার সম্রাট।"

"সম্রাট!" গলার স্বর যেন জুয়ামের স্পষ্ট হতে চায় না।

দেবতা বললেন, "হ্যাঁ। সম্রাট আমার দূত। তাকেই তোমার কাছে পাঠিয়েছিলুম।" তারপর আমার উদ্দেশে 'থথ' বললেন, "হে অশরীরী সম্রাট, তুমি আমাকে অত্যন্ত তৃপ্ত করেছ। যে মানুষ 'থথ'-এর আদেশ পালন করার জন্য মৃত্যুকে ভয় পায় না, সে অমর। তোমার জন্য আমার রইল চিরকালের আশীর্বাদ। তুমি মহান। এ পৃথিবী যতদিন থাকবে, তোমার কীর্তি ততদিন ঘোষণা করবে, স্নেহ আর ভালবাসার কাছে রাজসিংহাসন তুচ্ছ। একটি হতভাগ্য ছোট্ট মেয়েকে স্বার্থপর মানুষের জঘন্য চক্রান্ত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন যার কাছে কিছু না, সে যে দেবতার চেয়েও বড়। তাকে পূজা যে না করে, সে যে নিজেই ছোট্ট হয়!"

'থথ'-এর কথা শুনতে শুনতে আমার আত্মার চোখে কান্নার জল ছলছল করে ওঠে।

জুয়ামের চোখ ছুটি হয়তো এতক্ষণ ধরে খুঁজছিল আমায় শূন্য এই চারিদিকে। খুঁজে-খুঁজে সে বলে উঠল, "সম্রাট, তুমি কই?"

আমি বলতে পারলুম না কোনো কথা।

দেবতা বললেন, "তিনি ওইখানে দাঁড়িয়ে আছেন।"

"কেন, তিনি দেখা দেবেন না?" জুয়াম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"না, ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন তিনি অদৃশ্য হয়ে। ওইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তিনি তোমার গান শুনবেন।"

"আমার গান?"

"হ্যাঁ।"

"আমি যে গাইতে পারছি না।"

"তুমি না গাইলে সম্রাটের আত্মা শান্তি পাবে না জুয়াম।"

চুপ করে রইল জুয়াম একটুক্ষণ। তারপর দেবতা 'থথ'-এর মুখের দিকে চাইল। তারপর নদীর ধীর স্রোতের মতো সে দুলে উঠল। তার গলায় সুর বেজে উঠল।

গান গাইছে জুয়াম। সেই আমার স্বপ্নের গান। শুনছি, শুনতে-শুনতে কাঁদছি। কাঁদছি, সেই অন্ধকার রাত থেকে সূর্যের সকাল পর্যন্ত। ভাবছি, ছোট্ট ছোট্ট জুয়ামের মতো পৃথিবীর বুকে শিশুরা আছে বলেই বুঝি পৃথিবী এত সুন্দর!

হঠাৎ আমি দেখতে পেলুম, দেবতা 'থথ' তাঁর সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। তিনি কোলে তুলে নিলেন জুয়ামকে। খোলা আকাশের নীচে তিনি দাঁড়ালেন ক্ষণেক। তারপর জুয়ামকে নিয়ে তিনি শূন্য আকাশে ধীরে ধীরে ভেসে চললেন। সারা আকাশ মেতে গেল জুয়ামের গানে-গানে।

আমি আকুলস্বরে চিৎকার করে উঠলুম, "জুয়াম।"

জুয়াম উত্তর দিল না। জুয়াম গানই গাইছে। পৃথিবীর বাতাসে-বাতাসে সে-গান ভেসে যায়, আকাশের আলোয়-আলোয় সে-গান হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় জুয়ামও দেবতার সঙ্গে ওই শূন্যে।

আমি চিৎকার করে উঠলুম, "জুয়াম, জুয়াম। আমাকে একা ফেলে তুমি কোথা চলে যাচ্ছ? ফিরে এসো জুয়াম, ফিরে এসো। পৃথিবীতে হিংসা থাক, নিষ্ঠুরতা থাক, কিন্তু এই মৃত সম্রাটও তো আছে। সে যে তোমার গান শুনবে জুয়াম। একবার ফিরে এসো, শুধু একটিবার।"

না, জুয়াম শুনতে পেল না আমার ডাক, সাড়া দিল না সে আমার ডাকে। আর কোনোদিনই সে হয়তো সাড়া দেবে না। কেননা, আমার এই মৃত আত্মা পাঁচ হাজার বছর ধরে শুধুই তাকে ডেকেছে, শুধুই তাকে খুঁজেছে। কিন্তু হায়! সে দেখা দেয়নি আর। কোনোদিনই না।